সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • এপ্রিল-জুন ২০২৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

রিচার্ড ফাইনম্যান
(১১ মে ১৯১৮ - ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮)

রিচার্ড ফাইনম্যানের শিক্ষাচিন্তা ও গ্যালিলিও শিক্ষাব্যবস্থা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেয়া বই ও মানবতা ভাণ্ডারে কাপড় উপহার

১৯ মে ২০২৫-এ স্কলাস্টিকা স্কুলের (গুলশান ক্যাম্পাস, ঢাকা) শিক্ষার্থীরা ২০১টি বই উপহার দেয় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারকে যা বর্তমানে ১৩টি জেলায় ৪০টি স্কুল-কলেজে চলমান আছে। স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে এই বই উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কলাস্টিকার প্রিন্সিপ্যাল Syeda Fardah Farhana Alam, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সিদীপের পক্ষ থেকে ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স এন্ড একাউন্টস্) রুমানা শারমিন, শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম।

এসব বই পাঠকে কেন্দ্র করে মুক্তপাঠাগার সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোয় শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য English Story Reading শীর্ষক একটি কোর্স চালু করা হয়েছে।

এছাড়াও স্কলাস্টিকার ছোট্ট শিক্ষার্থীরা দুইশোর মত পুরনো ব্যবহারোপযোগী কাপড় গ্রামের দরিদ্র শিশুশিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য সিদীপের মানবতা ভাণ্ডারে জমা দেয়। কাপড়গুলো ঈদের আগেই গ্রামে বিভিন্ন দরিদ্র শিশুকে দেয়া হয় যাতে তাদের মুখেও হাসি ফোটে।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
শিক্ষালোক
এপ্রিল - জুন ২০২৫ ● ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচি

রিচার্ড ফাইনম্যানের শিক্ষাচিন্তা ও গ্যালিলিও শিক্ষাব্যবস্থা - আলমগীর খান ২

ভালোবাসায় গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী শিশু - আলাউল হোসেন ৫

স্কুলশিক্ষার লক্ষ্য এবং বাস্তবতা - অলোক আচার্য ৭

বাংলাদেশে ফুলের বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি সম্ভাবনা - এস এম মুকুল ৮

ঘুরে এলাম সীতাকুণ্ড - হুমায়ুন কবির ১১

ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা-অসুবিধা ও সম্ভাবনার কিছু দিক - শান্ত কুমার দাস ১৪

নাটোরে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি - সুমি খাতুন ১৫

সামাজিক সংগঠন জীবনতরীর কথা - ফাহ্‌মিদা জেসমিন ১৭

ইসমত আরা বেগম ও মোহাজ্জেমের কৃষিতে সফলতা - রিপন মিয়া ২০

একজন সফল কৃষকের গল্প - মো. মামুন আলী ২১

দ্বিজেন শর্মার জন্মবার্ষিকী ২৬

‘এবং বই’-এর আয়োজনে বুক রিভিউ প্রতিযোগিতা ২৭

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

শিক্ষালোকের বর্তমান সংখ্যায় শিক্ষা ও শিশুর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ নিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে। প্রচ্ছদের লেখাটিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি আমুল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। রিচার্ড ফাইনম্যান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানি। তিনি বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। শিক্ষা নিয়েও তাঁর চিন্তাভাবনা গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক শিওরলি ইউ আর জোকিং মি. ফাইনম্যান বইটিতে এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার চমৎকার প্রতিফলন আছে। এতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য শিক্ষণীয় অনেক বিষয় রয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান পাঠাগার ও সমাজকর্ম নিয়ে শিক্ষালোকে নিয়মিত লেখা ছাপা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে এবার নাটোরে একটি পাঠাগার ও রাজশাহীতে কর্মরত একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন নিয়ে লেখা দুটি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। দেশের নানা অঞ্চল জুড়ে যে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে, তার কিছু অংশ জানান দেওয়ার জন্যই এর প্রকাশ।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে একটি লেখা ও গ্রাম পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলনস্বরূপ দুটি সাফল্যগাথা আমাদের সংস্থার কার্যক্রমের সার্থকতার প্রমাণ।

এবার শিক্ষালোকের উদ্যোগে নানা ধরনের কাজ ও অনুষ্ঠান হয়েছে যা গুরুত্বপূর্ণ, ফলে জাতীয় পত্রপত্রিকায়ও এসেছে। ঢাকার বাইরে স্কুলকলেজে বইমেলা, মুক্তপাঠাগার, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা সভা এবং লেখক-শিল্পী সম্মিলনসহ এসব অভিনব ও সুন্দর আয়োজনের প্রতিফলন ঘটেছে চলতি সংখ্যায়।

আছে ফুলচাষ ও ভ্রমণের কথা। সবই পাঠকমনকে আনন্দিত ও আলোড়িত করবে বলে বিশ্বাস করি।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

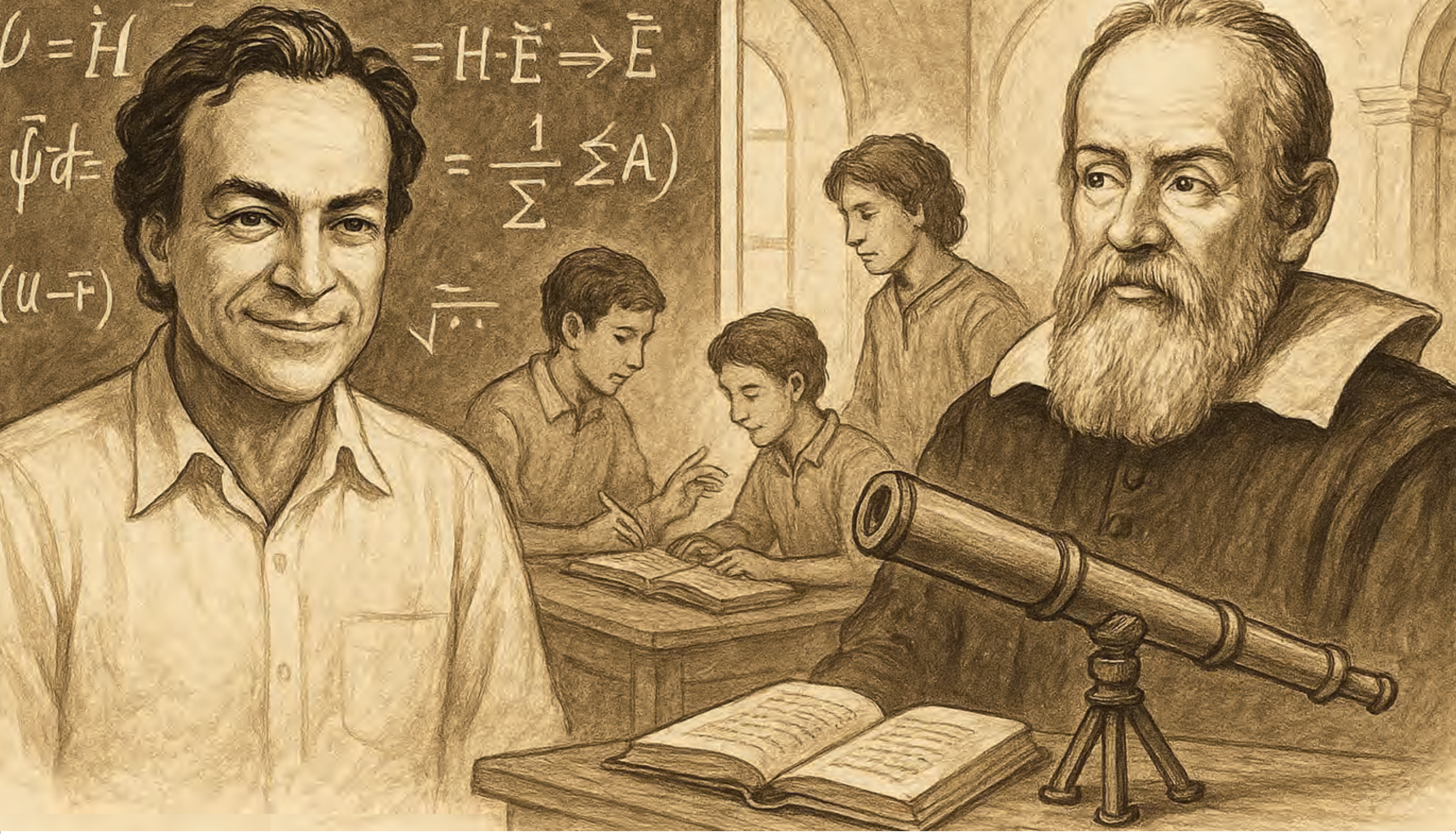

রিচার্ড ফাইনম্যানের শিক্ষাচিন্তা ও গ্যালিলিও শিক্ষাব্যবস্থা

আলমগীর খান

যুক্তরাষ্ট্রের নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড পি. ফাইনম্যান গত শতকের পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় একবার ঢাকায় এসেছিলেন। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) বিজ্ঞান একাডেমিতে তাকে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সের ওপর বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি অতি কষ্টে অল্পস্বল্প বাংলা শিখে ও দুজন বাঙালি ছাত্রের সহায়তায় সহজ বাংলায় তার বক্তৃতা প্রস্তুত করেন। নির্ধারিত দিনে বিজ্ঞান একাডেমিতে অনুষ্ঠান শুরু হলে দেশের পন্ডিতগণ ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু করেন। ফাইনম্যান ভড়কে যান, কেননা তিনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন বাংলায় বলার জন্য। যখন তার পালা এলো, তিনি ক্ষমা চাইলেন এই বলে যে, তিনি জানতেনই না এখানকার সরকারি ভাষা ইংরেজি, ফলে তিনি বাংলায় বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। সবার অনুমতি নিয়ে ফাইনম্যান বাংলায় তার বক্তৃতা সারলেন এবং তা সবার প্রশংসা পেলো। এবার বিজ্ঞান একাডেমির পরবর্তী বক্তারাও তাকে অনুসরণ করে বাংলাতেই বলা শুরু করলেন।

একটা ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে খুবই দুঃখিত। ফাইনম্যানের ঘটনাটি ঢাকার নয়, ব্রাজিলের আর তার প্রদত্ত বক্তৃতার ভাষাটি বাংলা নয়, ছিল পর্তুগিজ। বাকি ঘটনার বর্ণনায় কোনো ভুল নেই। এ ভুলকে আশা করছি সবাই ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। তবে ফাইনম্যান এখন ঢাকায় এলে এমন একটা ঘটনাই যে ঘটত না এ কথা কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। ঘটনাটির উল্লেখ আছে ফাইনম্যানেরই আত্মজীবনীমূলক 'শিওরলি ইউ আর জোকিং মি. ফাইনম্যান' শীর্ষক বইটিতে (১৯৮৫ সালে প্রকাশিত)।

যাই হোক, বছর দুই পর তিনি আবার যখন ব্রাজিলে গিয়ে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন, ওইসময় সেখানকার শিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞানশিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তার খুবই খারাপ ধারণা হয়। যদিও ব্রাজিলের তখনকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে সেটাকে খুব আদর্শ একটা শিক্ষাব্যবস্থা মনে হতো। নিজ দেশের শিক্ষা সম্পর্কে তাদের

উচ্চ ধারণার বেলুন ফুটা করে দিয়েছিলেন তৎকালীন স্পষ্টভাষী, সাহসী ও জনপ্রিয় এ মার্কিন বিজ্ঞানী। ব্রাজিলে অধ্যাপনাকাল শেষে বিদায়ের আগে তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সামনে একটি বক্তৃতা করতে রাজি হন এই শর্তে যে, তিনি যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবেন। আয়োজকদেরকে এই শর্তে আটকে তিনি সেখানে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন এই বলে– "ব্রাজিলে বিজ্ঞান শিক্ষা বলে কিছু নেই।"

স্বভাবতই হলে উপস্থিত সবাই নড়েচড়ে বসেন, তাদের কাছে এ ধরনের কথাবার্তা পাগলামি ছাড়া কিছু মনে হয়নি। অতএব তিনি শুরু করেন এভাবে, ব্রাজিলে প্রথমে এসে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান শিশুদের বিজ্ঞানে আগ্রহ দেখে। তারা অনেক ছোট্ট বয়সেই বিজ্ঞানের বই কেনা ও পড়া শুরু করে দেয় যা এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের বেলায়ও ঘটে না। তিনি শুরু করেন একটি গল্প দিয়ে।

গল্পটি এরকম: এক গ্রিক পন্ডিত লক্ষ করেন, গ্রিসের ছেলেমেয়েরা গ্রিক ভাষা পড়তে উৎসাহী নয়। অথচ ভিন্ন একটি দেশে গিয়ে দেখেন সেখানকার সব ছেলেমেয়ে বিদেশি গ্রিক ভাষা কঠোর পরিশ্রম করে শিখছে। তিনি খুব খুশি হয়ে এক শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে সক্রেটিসের ধারণা কী? সে কিছুই বলতে পারল না। এবার তিনি শিক্ষার্থীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তৃতীয় সিম্পোজিয়ামে সক্রেটিস প্লেটোকে কী বলেছিলেন। শিক্ষার্থীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল, সে নির্ভুলভাবে সব বলে গেল। অথচ সে যা বলল তাই ছিল সত্য ও সৌন্দর্যের মাঝে সম্পর্ক বিষয়ে সক্রেটিসের বক্তব্য। গ্রিক পন্ডিত তখন বুঝলেন যে, এই ছেলেমেয়েরা গ্রিক অক্ষর, শব্দ, বাক্য ও প্যারাগ্রাফ শিখছে, কিন্তু জানেই না কোন বিষয় বা কী শিখছে।

এরপর তিনি ব্রাজিলের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে বলেছিলেন, সেখানে অনেক বিজ্ঞান পড়ানো ও মুখস্থ করানো হলেও কোনো বিজ্ঞান শিক্ষা নেই। তিনি বলেন, "আমি বুঝতে পারছি না, এমন এক আত্মতুষ্ট ব্যবস্থায় কীভাবে কেউ কোনো কিছু শিখতে পারবে যেখানে সবাই পরীক্ষা পাশের জন্য পড়ছে আর শিক্ষকরা পরীক্ষা পাশ করা শেখাচ্ছেন, কিন্তু কেউ কিছুই শিখছে না।"

আমাদের এখনকার বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এমন একটা ঘটনা কিছুতেই ঘটত না, কেননা এখানকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা জানলে রিচার্ড ফাইনম্যানের বাবাও নিশ্চয়ই ভড়কে যেতেন। তবু এ আলোচনার অবতারণা করলাম কেননা এর মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারও অনেক নির্মম সত্য লুকিয়ে আছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কতখানি ভ্রান্ত নীতির ওপর পরিচালিত হচ্ছে তা বোঝার জন্য পৃথিবীকেন্দ্রিক ও সৌরকেন্দ্রিক মহাজাগতিক ধারণার উদাহরণ টানা যায়। মহাবিশ্ব পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান– টলেমির এ মত কয়েকশ বছর পৃথিবীকে শাসন করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস, কেপলার প্রমুখের অনুসন্ধান অনুসরণ করে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর হাতে ওই মডেল সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী হয়। সত্য প্রমাণিত হয় সৌরকেন্দ্রিক মডেল। বিজ্ঞানের ও মানুষের চিন্তার জগতে এটি ছিল এক বিরাট বিপ্লব।

আমাদের দেশের শিক্ষাজগতেও এমন একটি বিপ্লব আশু প্রয়োজন– সত্যতা ও গুরুত্বের বিচারে আমাদের জন্য যা একইরূপ মূল্যবান ও সুদূরপ্রসারী। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিকারের ফলদায়ক হয়ে উঠতে হলে এ আমূল পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। এ পরিবর্তনটি দিকনির্দেশক কাঁটা পশ্চিম থেকে পূর্বে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে কিংবা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেয়ার সমতুল্য। কেবল ওই কারণেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে মহাকাশের টলেমিয় থেকে গ্যালিলিও ধারণায় পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভ্রান্ত টলেমিয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এ ব্যবস্থা সচল আমলাতান্ত্রিক পরীক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। পরিবর্তিত গ্যালিলিও শিক্ষাব্যবস্থায় এটি অবশ্যই শিক্ষার্থী-শিক্ষককে কেন্দ্র করে হতে হবে। পরীক্ষা, মুল্যায়ন, নিয়মশৃঙ্খলা, স্কুলঘর, শিক্ষা-উপকরণ, পরিদর্শক, আমলাতন্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসহ শিক্ষাব্যবস্থার সবই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে। শিক্ষার্থীকে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এই পুরো দায়িত্বটি পালন করেন প্রধানত শিক্ষক। স্বভাবতই শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক– এই দুই সত্তা। তাত্ত্বিকভাবে এটা হওয়াই উচিত, কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্পূর্ণ উল্টো।

বাংলাদেশে শিক্ষা নামক শকটের নিচে সবার আগে চাপা পড়ে শিক্ষার্থী আর শিক্ষক। তারা কেবল শকটকে সচল রাখার দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা নামক বিরাট নাক্ষত্রিক জগতের কক্ষপথে কোনোমতে ঝুলে থেকে প্রাণ রক্ষা করে চলেন। সার্থক শিক্ষক হিসেবে পরিচিত হন তিনিই যিনি সারাজীবন গা বাঁচিয়ে চলতে পেরেছেন আর হিসেব করে বলতে পারবেন কতজনকে তিনি শকটের নিচে ফেলে উচিত শিক্ষা দিতে পেরেছেন। শিক্ষার্থীকে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা তাদের জন্য অলীক কল্পনা মাত্র। কারও কারও সর্বোচ্চ গর্ব হয়তো কতজনকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা আমলা ইত্যাদি বানাতে পেরেছেন। এরূপ বানাতে গিয়েও তিনি জানেনই না যে, কতজন সম্ভাব্য শিল্পী,

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের পুনর্জন্ম লাভের মতো ঘটনা। কিন্তু সত্যিকার মানুষ হওয়ার মতো পুনর্জন্ম ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের তোতাপাখির মতো শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ট্র্যাজেডি তৈরি কিছুতেই কাম্য নয়। আগে শিক্ষার্থী ও পরে শিক্ষক এবং তাদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে আমাদের বিশাল শিক্ষাজগতটি

বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক বা সমাজকর্মীকে তিনি ওই শকটের নিচে ফেলে ট্র্যাজিক সাফল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন।

শিক্ষাকে শিক্ষার্থী-শিক্ষককেন্দ্রিক করার কথা বলা যত সহজ, তা বোঝা ও অনুধাবন করা তারচেয়ে অনেক কঠিন আর বাস্তবায়ন আরও কঠিন। তবে অসম্ভব নয় যে তার প্রমাণ উন্নত দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের মতো পশ্চাদপদ দেশগুলোতে শিক্ষার্থীকে জড় পদার্থ হিসেবে মনে করা হয়, এখানে শিক্ষা একটি দান প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষক দাতা ও শিক্ষার্থী গ্রহীতা মাত্র এবং শিক্ষক যে কলের চালক শিক্ষার্থী তার কাঁচামাল। শিক্ষা নামের জ্ঞানরস ঢেলে দেয়ার প্রক্রিয়ায় শিক্ষকও জড়পদার্থতুল্য– উভয়ের সম্পর্ক জগ ও মগের। বিদ্যার আলয়ে বসে জ্ঞান নামক রস তরল পদার্থের মতো জগ থেকে মগে ঢেলে দেয়ার জিনিস নয়। তাদের প্রকৃত সম্পর্ক অর্থাৎ যা হওয়া উচিত তা পিতা-পুত্র বা মা-মেয়ের মতো– উভয়ে উভয়ের অস্তিত্বের ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

আমাদের দেশে এমন সম্পর্ক গড়ে না উঠবার কারণ মানহীন শিক্ষক। শিক্ষক মানহীন হওয়ার কারণ অনেক, কেবল স্বল্প বেতন নয়। আর মানহীন শিক্ষকও শিক্ষাব্যবস্থাকে টলেমিয় যুগে ফেলে রেখেছেন। মানসম্মত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষাকে গ্যালিলিও যুগে উত্তরণ আকাশ কুসুম কল্পনা। শিক্ষা শিক্ষককেন্দ্রিক হলেই কেবল তা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হবে, আবার একইসঙ্গে উল্টোটাও সত্য।

আমাদের উপনিবেশ-পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা এমনই ছিল। গ্রাম্য সে উঠানের ওপর কিংবা গাছতলার পাঠশালায় শিক্ষকই ছিলেন সর্বেসর্বা। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র থেকে উচ্ছেদ করে বাহিরের কক্ষপথে ছুঁড়ে ফেলে। যা শিক্ষককে করে চাকরি হারানোর ভয়ে সর্বদা কাবু ও শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল থেকে ঝরে পড়ার রীতি। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থার কুফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে রাহমান চৌধুরীর 'বাংলার চারশো বছরের প্রাথমিক শিক্ষা' বইতে (শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০১৪)।

এই ব্যবস্থায় শিক্ষক ক্রমে হয়ে উঠেছেন মানহীন। এই মানসম্মত শিক্ষকের অভাব বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা জুড়ে– একেবারে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। ভালো ও মানসম্মত সত্যিকারের ভালো শিক্ষক যে কেউ নেই তা নয়, কিন্তু যারা আছেন তারা ভগ্নাংশ বা দশমিক পরবর্তী সংখ্যা, তাই মোট হিসেবে না আনলেও চলে। আর যাও বা ভালো শিক্ষক এতকাল ছিলেন এখনকার ক্রমাগত পরিবর্তিত বাণিজ্যমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় ওই সংখ্যাটা প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীর চোখে শিক্ষক হারাচ্ছেন শ্রদ্ধা। যা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এমনসব অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটছে যাকে স্পষ্টতই ভালো শিক্ষার্থীর অভাব বলে চিহ্নিত করা যায়। সেটি তো আবার ভালো শিক্ষকের অভাবই প্রমাণ করে। ভালো শিক্ষক না থাকলে ভালো শিক্ষার্থী কোথা থেকে তৈরি হবে? টলেমিয় শিক্ষাব্যবস্থার শেষ পরিণতি এই এবং ভবিষ্যতে তা আরও খারাপ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তর করতে গেলে মুখস্থ, পরীক্ষা, আমলাতান্ত্রিক শৃঙ্খলার উর্ধ্বে উঠে একে প্রকৃত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে যেখানে মনুষ্যত্বের সাধনাই প্রধান, অগাধ টাকা তৈরির মেশিন হওয়া নয়।

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের পুনর্জন্ম লাভের মতো ঘটনা। কিন্তু সত্যিকার মানুষ হওয়ার মতো পুনর্জন্ম ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের তোতাপাখির মতো শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ট্র্যাজেডি তৈরি কিছুতেই কাম্য নয়। আগে শিক্ষার্থী ও পরে শিক্ষক এবং তাদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে আমাদের বিশাল শিক্ষাজগতটি।

ভালোবাসায় গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী শিশু

আলাউল হোসেন

শিশুর জন্ম মানেই কেবল নতুন একটি প্রাণের আগমন নয়, বরং একটি নতুন সম্ভাবনার সূচনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন একটি অনুকূল, স্থিতিশীল ও স্নেহঘেরা পরিবেশ। আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির উৎকর্ষ, কর্মব্যস্ত জীবনধারা ও পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশেও দেখা দিয়েছে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও অনুভূতিশূন্যতা। এই প্রেক্ষাপটে পিতা-মাতার সান্নিধ্য, ভালোবাসা, মনোযোগ এবং নিরাপত্তা শিশুর মানসিক স্থিতি ও আত্মবিশ্বাস গঠনের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামক হয়ে উঠেছে।

পারিবারিক ভালোবাসাই শিশুর মানসিক ভিত

শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষা আসে তার পরিবার থেকে। একটি শিশুর মনে প্রথম যে ধারণাটি গড়ে ওঠে– 'আমি নিরাপদ', 'আমি মূল্যবান'– সেটি গড়ে দেয় তার আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি। এই অনুভূতিগুলো জন্মায় তখনই, যখন সে পিতা-মাতার কাছ থেকে নিঃশর্ত ভালোবাসা, স্নেহ ও সম্মান পায়।

ভালোবাসা মানে শুধু শিশুকে আদর করা বা তার চাহিদা পূরণ নয়, বরং তাকে বোঝা, তার অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল থাকা এবং তাকে একজন মানুষ হিসেবে সম্মান করা। শিশুরা ছোট হলেও তাদের অনুভূতি, ভাবনা ও জগৎ রয়েছে। বড়দের দায়িত্ব তাদের সেই অভ্যন্তরীণ জগতে প্রবেশ করে বোঝার চেষ্টা করা।

যখন শিশুরা দেখে তাদের মা-বাবা তার কথায় মনোযোগ দিচ্ছেন, তার অনুভবকে গুরুত্ব দিচ্ছেন– তখন সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে শেখে। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুভবই তাকে ভবিষ্যতে আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

ভালোবাসার বাস্তব রূপ সময় দেওয়া

বর্তমান সমাজে কর্মব্যস্ততা একটি বাস্তব চিত্র। বাবা-মা হয়তো দুজনেই কর্মজীবী, দিন শেষে ক্লান্ত। তবুও শিশুর জন্য সময় দেওয়া একান্ত জরুরি। এই সময় হতে হবে 'মানসম্পন্ন সময়'– যেখানে বাবা-মা শুধু পাশে বসে থাকেন না, বরং শিশুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন, খোলামেলা কথা বলেন, খেলেন কিংবা তার ভাবনার অংশীদার হন।

শিশুরা সময়কে ভালোবাসা হিসেবে দেখে। তারা বুঝতে পারে, বাবা-মা যদি তার সঙ্গে গল্প করেন, খেলার সময় পাশে থাকেন, কিংবা স্কুল থেকে ফিরে এসে তার দিনের গল্প শুনতে আগ্রহ দেখান– তাহলে তারা ভালোবাসা পাচ্ছে। অন্যদিকে যদি শিশুর মুখের কথা না শোনা হয়, তার প্রশ্নকে গুরুত্ব না দেওয়া হয় কিংবা মোবাইল-টিভির চাপে বাবা-মা নিজেই ব্যস্ত থাকেন– তাহলে শিশুর মনে জন্ম নেয় অবহেলার বোধ।

এই অবহেলা থেকেই জন্ম নিতে পারে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, অসহযোগিতা, আচরণগত সমস্যা এমনকি মানসিক অবসাদ। তাই বাবা-মা যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, প্রতিদিন অন্তত কিছু নির্ধারিত সময় শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত– যেখানে শুধুই 'তাদের সময়' থাকবে।

মানসিক স্থিতির মূল ভিত্তি নিরাপত্তা

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য শুধু শারীরিক নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন মানসিক নিরাপত্তা। মানসিক নিরাপত্তা মানে এমন একটি পরিবেশ, যেখানে সে তার ভাবনা, ভুল, প্রশ্ন কিংবা আবেগ প্রকাশ করতে পারে বিনা ভয়ে, বিনা লজ্জায়।

যদি শিশুকে প্রতিনিয়ত তুলনা করা হয়, তার ভুলকে কঠোরভাবে দমন করা হয়, বা তিরস্কারের মুখে ফেলা হয়– তাহলে তার ভেতরে গড়ে ওঠে ভয়, সন্দেহ ও আত্মগ্লানি। এই ভয়-ভিত্তিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু হয় আত্মগোপনকারী, নয়তো বিদ্রোহী।

অন্যদিকে যদি পরিবারে এমন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যেখানে শিশুর ভুলকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখা হয়, মত প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং আবেগের প্রকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়– তাহলে সে মানসিকভাবে স্থিতিশীল, ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিপক্বভাবে বেড়ে ওঠে।

শিশুর অনুভূতি বোঝা

শিশুরা সব সময় তাদের অনুভব কথা দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। অনেক সময় তাদের চোখ, মুখ, আচরণ কিংবা নিরবতায় লুকিয়ে থাকে হাজারো কথা। তাই বড়দের দায়িত্ব, এই 'নীরব ভাষা' বোঝার জন্য সংবেদনশীল হওয়া।

যেমন, একটি শিশু হঠাৎ করে একা হয়ে যাচ্ছে, কথা বলছে না, আগের মতো খেলতে চায় না– এই পরিবর্তনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। বাবা-মা যদি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কেমন আছো?"–তবে উত্তর না দিলেও, পাশে বসে সময় কাটানো, আদর করা কিংবা ছোট ছোট কথায় আন্তরিকতা প্রকাশ করা শিশুকে স্বস্তি দেয়। ধীরে ধীরে সে খোলামেলা হয়।

একটি ভুল ধারণা হলো–"শিশুরা ছোট, তারা কষ্ট বুঝে না।" বাস্তবে শিশুরা কষ্ট অনুভব করে কিন্তু তা প্রকাশ করতে জানে না। তাই তার অনুভূতির প্রতি যত্নবান হওয়া, তার অভিজ্ঞতার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা এবং প্রয়োজন হলে প্রফেশনাল কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করাও হতে পারে দায়িত্বশীলতার অংশ।

সম্পর্কের সেতুবন্ধনে খোলামেলা কথা বলা

বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্ক যদি শুধু 'নির্দেশনা দেওয়া' বা 'নিয়ন্ত্রণ' এর পর্যায়ে থাকে, তবে সে সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠতে পারে না। শিশুকে এমনভাবে বড় করতে হবে, যাতে সে যেকোনো কথা মা-বাবাকে বলতে পারে, ভয় না পেয়ে, সংকোচ না করে।

এই খোলামেলা সম্পর্ক তৈরি হয় ছোট ছোট মুহূর্তে– একসঙ্গে খাওয়ার সময়, রাতে ঘুমানোর আগে গল্প বলা, স্কুল থেকে ফিরে অভিজ্ঞতা শোনার মাধ্যমে। এইসব সময়গুলোতে শিশুরা নিরাপদ বোধ করে এবং ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয় নিজেদের অনুভব প্রকাশ করতে।

এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে 'ভুল' করলে শিশুকে তিরস্কার নয়, বরং বোঝানোর সুযোগ দেওয়া হয়। যেখানে প্রশ্ন করলে তাকে বোকা বলা হয় না, বরং উৎসাহ দেওয়া হয় আরও জানার জন্য।

আত্মবিশ্বাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা

একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ গড়ে ওঠে শৈশবের ভিত্তির ওপর। আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয় তখনই, যখন সে দেখে তার পরিবার তাকে বিশ্বাস করছে। তার সিদ্ধান্ত, ভাবনা, সৃজনশীলতা ও ব্যর্থতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পরিবারের সদস্যরা যখন শিশুকে ছোট কাজেও উৎসাহ দেয়– যেমন নিজের কাজ নিজে করা, পড়ার বই গুছিয়ে রাখা, রান্নাঘরে সহায়তা করা– তখন সে নিজের গুরুত্ব অনুভব করে। পরিবার যদি শিশুর সৃজনশীল উদ্যোগকে সম্মান করে, তার ভুলকে গঠনমূলকভাবে সংশোধন করে এবং তার প্রতিভাকে পরিচর্যা করে– তবে সে আত্মবিশ্বাসী, উদ্যমী ও স্থিতিশীল একজন মানুষে পরিণত হয়।

শিশু মানেই কেবল পুতুল খেলা বা স্কুলের পড়া নয়। শিশু মানে একটি সংবেদনশীল হৃদয়, যার মধ্যে রয়েছে অসীম কল্পনা, অভিমান, প্রশ্ন ও সম্ভাবনা। এই হৃদয় যদি সঠিকভাবে যত্ন না পায়, ভালোবাসা না পায়, মনোযোগ না পায়– তবে তার ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়।

তাই আজকের এই দ্রুতগতির জীবনে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্তানদের জন্য সময় বের করা। তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলা, মন দিয়ে শোনা, হাসিতে সাড়া দেওয়া, কষ্টে পাশে দাঁড়ানো। শিশুদের কাছে 'বাবা-মা' যেন শুধু অভিভাবক না হয়ে হন বন্ধু, দিকনির্দেশক ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

একটি ভালোবাসাময় ও নিরাপদ পরিবারই পারে শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে, যেখানে সে আত্মবিশ্বাসী, অনুভূতিশীল ও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। কারণ, যত বড়ই হোক ভবিষ্যৎ– তার শুরুটা হয় ছোট একটি ভালোবাসায় ভরা ঘর থেকে।

লেখক: কবি ও শিক্ষক

স্কুলশিক্ষার লক্ষ্য এবং বাস্তবতা

অলোক আচার্য

শিক্ষা মূলত একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া যেখানে একজন মানুষ জন্ম গ্রহণের পর থেকেই নিয়মিতভাবে শিক্ষা গ্রহণের ভিতরেই অবস্থান করে থাকে। আমরা আজীবনের জন্য ছাত্র। ব্যক্তির স্কুলিং শুরু হয় প্রাথমিক স্কুল থেকেই। এটা কেবল বই থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্যই স্থাপন করা হয় না বরং এটি নৈতিক ও আদর্শিক চর্চারও উপযুক্ত স্থান। স্কুলের দর্শনই এটা। যদিও আমরা অধিকাংশই এই দর্শন থেকে বিচ্যুত এবং কেবল সার্টিফিকেট অর্জনের স্থান ছাড়া স্কুলকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছি না। স্কুলেরই পরবর্তী ধাপ যথাক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও একই প্রক্রিয়ায় সার্টিফিকেট অর্জন করতে ছুটছি এবং মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি। স্কুলের অন্যতম একটি বিষয় হলো, শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সম্পর্কের মূল্যায়ন। এটি কখনো মধুর, অম্লমধুর এবং চিরন্তন ও স্থায়ী। যদিও সাম্প্রতিক প্রবণতায় লক্ষ্য করা যায় যে সম্পর্ক অবনতি হয়েছে। একজন শিশুর জীবনে স্কুলটা আসলে কেন প্রয়োজন সেটা জানতে হবে।

এক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থই বলা যায়। এখন কেন ব্যর্থতা সে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা কিন্তু ইদানিং আমাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাই কেবল ভালো ফল করতে অর্থাৎ সমাজের চোখে সম্মানজনক এমন রেজাল্ট করতে যা ভবিষ্যতে ভালো চাকরির সহায়ক হতে পারে। আমরা চাই না আমাদের সন্তানেরা প্রকৃত মানুষ হোক। আমরা চাই না আমাদের সন্তানেরা শিক্ষা গুরুর আদর্শকে অনুসরণ করুক। আমরা চাই স্কুল থেকে ওরা গাদা গাদা বাড়ির কাজ আনুক, সেগুলো রাত জেগে তৈরি করুক এবং পরীক্ষায় সব প্রশ্ন কমন পাক ও ভালো রেজাল্ট নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরুক। আমরা যদি সেটাই চাই তাহলে স্কুলের উদ্দেশ্য ভুলপথে পরিচালিত হলে তার দায় কে নিবে?

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী এ.পি.জে আবদুল কালাম শিক্ষা নিয়ে খুবই চমৎকার একটি মন্তব্য করেছেন: 'যতদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি পাওয়া হবে, ততদিন সমাজে শুধু চাকররা জন্মাবে, মালিক নয়।' যে কথার প্রমাণ আমরা আজকের সমাজে দেখছি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের আজকের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল চাকরি পাওয়া। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই নানা প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার শিক্ষা মানুষ প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিল। এরপর সভ্যতার বিকাশে শিক্ষার ধারা এবং কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। এখনও হচ্ছে। শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছে সবাই। এই প্রয়োজনের তাগিদেই এবং সংখ্যানুপাতিক শিক্ষার হার বাড়াতে গিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেন শিশু পরিবার এবং বাড়ির মানুষ ছেড়ে ভিন্ন পরিবেশে সমাজের আরও দশজন শিশুর সাথে লেখাপড়া শিখতে পারে, ভাল আচরণ অর্জন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সেটা কাজে লাগাতে পারে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের সন্তানেরা সেই পথে হাঁটছে না। তারা স্কুলে যাচ্ছে কারণ যেতে হবে বা পরিবার থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তারা পড়ছে তবে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, পড়ছে কারণ পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে, তারা স্কুল জীবন শেষ করছে তবে প্রকৃত স্কুলিং ছাড়াই। এটা আমাদের সকলের ব্যর্থতা। আমরা যে স্কুল চাই বা চেয়েছি সেই স্কুল গড়ে তুলতে আমাদের উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট

বাংলাদেশে ফুলের বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি সম্ভাবনা

এস এম মুকুল

শের আলীর হাত ধরে ফুলের রাজধানী গদখালী

যশোর থেকে বেনাপোলের দিকে যেতে ছোট জনপদ গদখালী। ঝিকরগাছা উপজেলা সদর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত এই জনপদটির মাঠের যেদিকে চোখ যায় শুধু ফুল আর ফুল। এখানকার প্রায় ৪০টি গ্রামে উৎপাদিত হয় রজনীগন্ধা, গোলাপ, গ্লাডিওলাস ও জারবেরাসহ বিভিন্ন ফুল। অন্যান্য অর্থকরী ফসলের পাশাপাশি ফুল চাষ করেও যে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া যায় তা করে দেখিয়েছেন গদখালীর মানুষ। অনুসন্ধানে জানা যায়, গদখালীতে ফুলের চাষ শুরু হয় ফুল চাষী শের আলীর হাত ধরে। ১৯৮৩ সালে ভারত থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের বীজ এনে যশোরে গদখালীতে মাত্র ৩০ শতক জমিতে রজনীগন্ধা ফুল চাষের মাধ্যমে দেশে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ ও বিপণন শুরু করেন কৃষক শের আলী সরদার। এখন সেখানে মাঠের পর মাঠজুড়ে দেখা যায় নানা রঙের, বর্ণের ও জাতের ফুল। বর্তমানে গদখালীর ৭৫টি গ্রামের পাঁচ হাজার চাষীসহ পাঁচ লাখ মানুষ ফুল উৎপাদন ও বিপণনে জড়িত। এখানকার উৎপাদিত ফুলের ৪০ শতাংশ ঢাকার খামারবাড়ি পাইকারি বাজারে এবং ৬০ শতাংশ সারা দেশে সরবরাহ হয়। সারা দেশে চাহিদার ৭০ শতাংশ ফুল এ অঞ্চলে উৎপাদন হয়। তবে যশোর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকার সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ করা হচ্ছে। শের আলী এরপর সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া থেকে অনেক ফুলের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করেন। এখন ঝিকরগাছার দেড় হাজার হেক্টর জমিতে ফুলের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে কমপক্ষে সাত হাজার মানুষ। এখানে বিঘা প্রতি সিজনে কৃষকরা আয় করেন প্রায় ৫-৭ লাখ টাকা।

সময় পরিক্রমায় পথ দেখানো সেই গদখালীকে এখন ফুলের রাজধানী বলা হয়। ফুল চাষে শের আলী সরদারের ব্যাপক অবদানের জন্য তাকে স্থানীয়ভাবে ফুল চাষের জনকও বলা হয়। সারাদেশে যে ফুল উৎপন্ন হয় তার অন্তত ৭০ ভাগ হয় এই গদখালীতেই। আশির দশকে যে গদখালীতে এক বিঘা জমিতে ফুলের চাষ হয়েছিল সেখানে এখন প্রায় ১৮শ' বিঘা জমিতে ফুলের চাষ হচ্ছে। তবে ঝিকরগাছার গদখালী এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী শার্শা উপজেলাতেও ফুল চাষ ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ফুলচাষীরা বলছেন- বর্তমানে ঐ এলাকায় প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমিতে ফুলের চাষ হচ্ছে। এসব জমি থেকে ভরা মৌসুমে প্রতিদিন অন্তত ২ লাখ রজনীগন্ধার স্টিক, ৪ লাখ গাঁদা ফুল, ৩০ হাজার গোলাপ, ৫০ হাজার গ্লাডিউলাস ফুলের স্টিক উৎপন্ন হয়। অন্যান্য ধরনের ফুল উৎপন্ন হয় প্রায় ৩০ হাজার।

আশা জাগাচ্ছে বিদেশি ফুলের চাষ

বাংলাদেশে ফুলের সম্ভাবনাময় বাজার রয়েছে। বিশ্ব বাজারে অনেক জাতের ফুল আছে। কিন্তু দেশে ফুলের বেশি একটা জাত নেই। দেশে প্রতিনিয়ত ফুলের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে ফুল এনে চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। এই অবস্থা কাটাতে দেশে বিদেশি ফুল চাষে আগ্রহ বাড়ানো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফুল চাষীরা বিদেশি ফুল চাষে অধিক লাভ পাওয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এই উদ্যোগ পুরোমাত্রায় বাস্তবায়িত হলে সারা বছর বিদেশি প্রজাতির বিভিন্ন জাতের ফুল চাষ করে দেশের চাহিদা মেটানোর পর রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির কর্মকর্তাদের মতে, রজনীগন্ধা, গোলাপ, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকার মতো ফুল চাষে দেশের কৃষকরা অনেক আগে থেকেই সিদ্ধহস্ত। এখন তাদের জমিতে ফুটছে জারবেরা, গ্লাডিওলাসের মতো আমদানি-বিকল্প ফুল। এমনকি অর্কিডও আবাদ হচ্ছে দেশে। তাই এখন আর মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড থেকে ফুল আমদানি করতে হচ্ছে না। বাংলাদেশ থেকে কিছু কিছু ফুল এখন রপ্তানিও হচ্ছে। তবে পরিমাণে কম হলেও সবজির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে কিছু ফুল আমাদের দেশের রপ্তানিকারকরা পাঠিয়ে থাকেন। সম্প্রতি মালয়েশিয়া ও জাপানে বাণিজ্যিকভাবে ফুল রপ্তানির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষকদের মাধ্যমে বিদেশি ফুল চাষ প্রসারে এগিয়ে এসেছে দেশের শীর্ষ বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেটাল এগ্রো লিমিটেড। জাপান থেকে সরাসরি বীজ এনে তা কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেছে তারা। পঞ্চগড়সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় দীর্ঘদিন ধরে শীত মৌসুম চলে। এই শীতকে কাজে লাগিয়ে বছরের বেশী সময় ধরে এই অঞ্চলে শীতকালীন ফুল চাষ করা সম্ভব। বিশেষ করে শীত প্রধান দেশ থেকে উন্নত প্রজাতির ফুলের বীজ এনে দেশে তা প্রসার ঘটালে উত্তরাঞ্চলে ফুল চাষে বিপ্লব ঘটাতে পারে। কৃষকদের ফুল চাষে বড় অন্তরায় সঠিক বীজের অভাব। মেটাল এগ্রো সরসরি বিশ্বের বিখ্যাত বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান টাকি সীড কোম্পানী থেকে ফুলের বিভিন্ন প্রজাতির বীজ আনছে। প্রাথমিকভাবে তারা পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার নগর চেংঠী এলাকার কাওয়াপুকুর গ্রামে নিজেদের খামারে এই বীজ দিয়ে ফুল উৎপাদন করে সাফল্য পেয়েছে। খামারের হরেক রকমের বিদেশী ফুল দেখে স্থানীয় কৃষকরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নার্সারী মালিক ও কৃষকরা ফুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তাদের এই প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি। সরসরি কনসালটেনসি দিচ্ছেন দীর্ঘ ২২ বছর ধরে চীনের কুনমিংয়ে বিদেশী ফুল নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ড. হেইদি ওয়েরনেট।

কেন্দ্রীয় ফুল বিপণন কেন্দ্র ঢাকায়

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অধিকাংশ ফুলই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্রি হয়। ঢাকার শাহবাগ ও আগারগাঁওয়ে রয়েছে পাইকারি ফুলের বাজার। খুচরা বিক্রেতারা এসব জায়গা থেকে ফুল কিনে শহরে ছড়িয়ে পড়েন। ফুলের ব্যাপক চাহিদা ও বিরাট সুযোগ থাকার পরেও ফুল বিক্রির জন্য ঢাকায় কোনো কেন্দ্রীয় বাজার নেই। যদিও কেন্দ্রীয়ভাবে ফুলবাজার নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন ফুল বিক্রেতারা। আশার খবর হলো এরই প্রেক্ষিতে রাজধানীর গাবতলীতে প্রায় দেড় একর জমির ওপর দুইতলা ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে ফুলচাষীদের জন্য স্থায়ী বাজার তৈরি হচ্ছে। ভবনটি হবে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

ফুলের বিশেষায়িত বাজার ও সংরক্ষণাগার যশোরে

দেশে ফুল চাষের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত অঞ্চল যশোর। গোলাপ, রজনীগন্ধা, জারবেরাসহ ১১ প্রজাতির ফুল সারা বছর চাষ হয় এখানে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিবস ঘিরে ভালো ব্যবসা করলেও বছরের অন্যান্য সময় ফুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব ও ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় চাষীদের। এ অবস্থায় ফুলচাষীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীতে ফুলের বিশেষায়িত বাজার ও সংরক্ষণাগার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। জানা গেছে, কৃষি উন্নয়ন অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় ফুলের বাজারটি নির্মাণ করা হবে। সেখানে আধুনিক মোড়কীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা হবে ফুলের বাজারজাত প্রক্রিয়ায়। এরফলে শ্রমের ন্যায্যমূল্যও পাবেন

চাষীরা। গদখালীর বিশেষায়িত ফুলের বাজার ছাড়াও যশোরের গ্রামাঞ্চলে আরো ১২টি আধুনিক বাজার ও ১২টি কালেকশন সেন্টার নির্মাণ হবে এলজিইডির কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়। এসব বাজার ও সেন্টারে চাষীদের উৎপাদিত সবজি ও ফুল আনা-নেয়ার সুবিধার্থে নির্মাণ করা হচ্ছে ১০০ কিলোমিটার রাস্তা।

শেষ কথা

দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে সমাজের নানা স্তরে ফুলের ব্যবহার বাড়ছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে ফুলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফুল চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগোনোর জন্য এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি নীতি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে উৎপাদিত ফুল বিদেশে রপ্তানির জন্য প্যাকেজিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, হিমাগার স্থাপন, ফুলের নতুন নতুন জাত উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির সংশ্লিষ্টরা জানান, সম্ভাবনাময় ফুলশিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এর সঙ্গে জড়িত কৃষক ও উদ্যোক্তাদের স্বল্প হারে ঋণ সুবিধা প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাপ্তি ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, উন্নত ও নতুন নতুন জাতের বীজ সরবরাহ করা, ওয়্যারহাউস ও কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ এবং সর্বোপরি অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি। এ ছাড়া ফুল খাতের বিকাশে হিমাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশের ফুল চাষসহ কৃষি খাতের উন্নয়নে 'ওয়্যারহাউস নির্মাণ' করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা। ফুল চাষীদের অভিযোগ- প্রশিক্ষণের অভাব, মানসম্মত বীজের স্বল্পতা, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি কারণে ফুল শিল্পে আশানুরূপ উন্নতি করা যাচ্ছে না। দেখা গেছে পরিবহন ব্যবস্থার অভাবের কারণে অনেক সময় ফুল পচে বড় ধরনের ক্ষতি সম্মুখিন হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধান করা গেলে ফুলের উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হবে। আবার ফুল রপ্তানিকারকদের মতে এ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। ফুল দু'একদিন তাজা থাকে তারপর নষ্ট হয়ে যায়। এ অসুবিধা দূর করার জন্য ফ্রিজার ভ্যানের প্রয়োজন। উন্নত জাতের ফুলের চাষের জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা, ফুল চাষীদেরকে পর্যাপ্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ সে সাথে ফুলের সংরক্ষণ, পরিবহন, প্যাকেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করতে হবে। তাহলেই এ খাতে রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ব্যাংকগুলো ফুলচাষীদের ঋণ দিতে খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। অনেকের দাবি-অবিলম্বে গদখালীতে একটা স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা দরকার। ফুল চাষ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং লাভজনক হলেও সরকারি আর্থিক সহায়তার অভাবে এগুতে পারছেনা ফুল চাষী ও ব্যবসায়ীরা। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে ফুল চাষ করে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার দেশের ফুলচাষী ও ফুল ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা ও প্রয়োজনে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানে সরকারের সহযোগিতায় বিকশিত হোক ফুলবাণিজ্য।

লেখক: কলামিস্ট ও সাংবাদিক

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে নববর্ষ ও পিঠা উৎসব উদযাপন

ঘুরে এলাম সীতাকুণ্ড

হুমায়ুন কবির

প্রকৃতির এক লীলাভূমি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলা, একটি উপজেলায় এত বেশি পর্যটন পয়েন্ট আমার জানা মতে আর নেই বাংলাদেশে। পাহাড়, সমুদ্র, ঝর্ণা, ঝিরিপথের রূপ মুগ্ধকর এক অপরূপ সুন্দরের আধার সীতাকুণ্ড। ১০ জুন মঙ্গলবার আমরা ৭ জন ফাহিম মুনতাসির, আজিজা সোপানা, তাজিম, ফয়সাল, তাবাসসুম, হাসান ও আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে আসি তখন রাত ২.৩০ মিনিট, উদ্দেশ্য চিটাগং মেইল। আধাঘণ্টা লেইটে রেল এসে থামল স্টেশনে।

আমরা আগে থেকে বুকিং থাকা নির্ধারিত তাপানুকুল কেবিনে গিয়ে উঠলাম। আমি উপরের একটি সিট দখল নিলাম,ফাহিম নিল অপর দিকের উপরের একটা সিট, সোপানা আপা আর তাবাসসুম বসল নিচের একটি সিটে,অপর দিকের অন্য একটি সিটে বসল তাজিম,ফয়সাল ও হাসান। পরে তাজিম গিয়ে ফাহিমের সাথে সিট ভাগ করে। মোটামুটি আরামেই ট্রেন যাত্রা হয় আমাদের শুধু তাজিম আর ফয়সাল বারে বারে কেবিনের দরজা খুলে বের হওয়ায় ডিস্টার্ব হচ্ছিল আমার ঘুমের, তাজিমের এক কথা ঘুমোতে আসিনি, এসেছি ঘুরতে। তাজিম এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, মূলত তার আগ্রহেই এ আয়োজন। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে দূর আকাশের চাঁদটার দিকে তাকিয়ে মনে হল যতীন্দ্রমোহন বাগচির কাজলা দিদি কবিতাটি।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,
মাগো আমার শোলক বলার কাজলা দিদি কই?

আমি যতোটা পারি ঘুমানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম আমার কাছে সোনার হরিণের মত, একটু আলো চোখে লাগলে, কেউ কথা বললে, কোন শব্দ হলে আমার আর ঘুম হয় না, তবুও আমি ঘুমাবার ভান করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম, এ দিকে ফাহিম তার চিরায়িত অভ্যাসমতো এত কিছুর

মধ্যেই গভীর ঘুম দিল। বাকিরা ভ্রমণ উত্তেজনায় নির্ঘুম রাত্রি পার করলো।

সকাল ৮টার দিকে ট্রেন গিয়ে থামল সীতাকুণ্ড রেলস্টেশনে, চট্টগ্রাম মেইলে প্রায় সব যাত্রী নেমে গেলো এ স্টেশনে, সবাই আমাদের মতোই ঘুরতে এসেছে এখানে।

স্টেশনের আনুষ্ঠানিকতা সেরে রাস্তায় এসে দেখি শত শত মানুষ শহর জুড়ে, সবাই সিএনজি বা অটোরিকশার খুঁজে ব্যস্ত, গাড়ির থেকে যাত্রীর সংখ্যা বেশি হলে যা হয় আর কী, সুযোগ সন্ধানী ড্রাইভারেরা দুইগুণ তিনগুণ ভাড়া হাঁকছে মানুষের কাছ থেকে। বাধ্য হয়ে কেউ কেউ উঠছে, কেউ কেউ আবার দরদাম করে ভাড়া কমানোর চেষ্টা করছে। আমরাও কয়েকটি সিএনজি চালকদের সঙ্গে কথা বলেছি, আর সবার মতো দুইগুণ তিনগুণ ভাড়া শুনে সিদ্ধান্ত নিলাম আগে সকালের নাস্তা খাবো, এরপর ধীরে সুস্থ বের হবো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা শহরের ডিটি রোডে ভোজ পার্টি সেন্টারে নাস্তা করলাম, খেলাম তুন্দর রুটি আর ডাল সবজি, বিল হাতে পেয়ে দেখলাম এখানেও দামের হেরফের অনেক বেশি। এরপরও যেহেতু খাওয়া হয়ে গেছে, বিল পরিশোধ করে হোটেল থেকে বের হতেই পেলাম সিএনজি। চন্দ্রনাথ পাহাড় যাবো, মাত্র একশো বিশ টাকা ভাড়ায় সাতজন চললাম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে, সকালে এ সিএনজি চালকেরাই তিনশো চারশো টাকা ভাড়া চেয়েছিলো।

রাস্তার দুইদিকেই মন্দির আর মন্দির, যতো সামনে এগোই সবুজ মনোরম নির্জন নির্মল পাহাড়ের হাত ছানি। অবশেষে গিয়ে পৌঁছালাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ১১৫২ ফুট (৩৫০ মিটার)। এটি চট্টগ্রামের পশ্চিম রেঞ্জে অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম জেলার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সিদ্ধান্ত হলো আমরা প্রথমবারের মত কোন পাহাড় জয় করবো। এভারেস্ট জয় করতে পারিনি তো কী হয়েছে, আমরা চন্দ্রনাথ পাহাড় জয় করবোই।

কিন্তু সোপানা আপা বলল আমি যাবো না, আমি তোদের জন্য অপেক্ষা করবো, তোরা যা। আমরা প্রথমেই লাঠি কিনলাম, প্রতি লাঠির মূল্য ৩০ টাকা, পাহাড়ে উঠতে এ লাঠি তৃতীয় পা হিসেবে পাহাড়ি পথের বন্ধু।

পাহাড় থেকে ফিরে লাঠি ফেরত দিলে ২০ টাকা ফেরত দেওয়া হয়। ৬টি লাঠি নিয়ে ছয়জন নবীন পর্বতারোহী চলছি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উঁচুনিচু ভঙ্গুর পথ মাড়িয়ে। এ পাহাড়ে উঠতে শুরুতেই একটি দৃষ্টিনন্দন মন্দিরের দেখা মিলে, শ্রী শ্রী ক্রমদীশ্বর সশম্ভনাথ মন্দিরটির গেটে দাঁড়িয়ে কিছু স্থির চিত্র নিলাম। এরপর এক-এক করে দেখলাম অসংখ্য ছোট বড় মন্দির। ভক্তরা প্রত্যেক মন্দিরেই ভিড় করছে। নিজেদের বিশ্বাস মত করছে পূজা, ভক্তি। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির। আমরা ছয়জন নানা গল্পে পথ চলছিলাম শুধু ফাহিম একটু ব্যতিক্রম। ওর চিরচেনা স্বভাবমত নতুন নতুন মানুষদের সাথে পরিচিত হচ্ছে, হাঁটছে তাদের সঙ্গেই, যেন আমরা ওর সঙ্গের কেউ নই। আবার ওদের ছেড়ে মাঝে মধ্যে আসে আমাদের কাছেও। আমাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট তাজিমই প্রথম চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে। একে একে আমরা সকলে কাঙ্ক্ষিত চন্দ্রনাথ জয় করি। এখানে মানুষ

আর মানুষ, আছে তিন-চারটা কুকুর আর বানর। দর্শনার্থীরা বানরগুলোকে কলা খাওয়াচ্ছে, কুকুর গুলো ঘেউ ঘেউ করছে। বানরেরা কুকুরকে ভেংচি কাটছে আর ভক্তবৃন্দ ব্যস্ত মন্দিরের পূজা অর্চনায়। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায় যে প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে এখানে তিন দিনব্যাপী বসে ঐতিহ্যবাহী শিব চতুর্দশী মেলা। তবে মেলা তিন দিন হলেও এর স্থিতিকাল থাকে প্রায় মাসব্যাপী। প্রতিবছর এই মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে।

সীতাকুণ্ড বাজার থেকে পূর্বদিকে সাড়ে তিন কিলোমিটার পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির। এটি একটি জাগ্রত শিব মন্দির। সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় তেরোশো মিটার। মন্দিরের গাছে গাছে বাঁধা আছে লাল সুতা, বিশ্বাসীরা এখানে সুতা বেধে যায় নানান নিয়তে। আমারও মনে হয়েছে বেধে যাই একটুকরো লাল সুতা প্রিয়জনদের কল্যাণ কামনায়। যদিও বাধা হয়নি সুতা, কিন্তু অন্যরকম এক ভালোলাগা নিয়ে নামতে শুরু করলাম পাহাড়ের চূড়া থেকে। বাম দিক দিয়ে উঠলেও নামলাম ডানদিকের আরেক পাহাড়ি রাস্তা ধরে। জায়গায় জায়গায় দোকানিরা নানা পসরা সাজিয়ে বসে আছে, বিশেষ করে পানি, শরবত। মাঝে ক্লান্ত মানুষ থামে, পান করে পানি বা শরবত। একসময় নেমে এলাম সফল ভাবে চন্দনাথ পাহাড় জয় করে।

সোপানা আপা বসে আছে দুই ঘণ্টা যাবত একা একা। আমাদের দেখে উনিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নতুন করে আলোচনা করলাম এখন কোথায় যাবো। সিদ্ধান্ত হলো ঝর্ণা দেখতে যাবো। কিন্তু স্থানীয়রা বলল সবগুলো ঝর্ণাই মৃত, জলের ধারা নেই, এরপর সিদ্ধান্ত হলো সমুদ্র দেখবো, কেউ কেউ বলল কাদা পানি ছাড়া কিছু নেই। একজন সিএনজি চালক বলল সহস্রধারা ঝর্ণার কথা।

চারশো টাকায় সিএনজি ভাড়া করে ছুটলাম সহস্রধারা ঝর্ণার খুঁজে। ৩০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কাঙ্ক্ষিত জায়গায়। জনপ্রতি ৮০ টাকা প্রবেশ মূল্যে ঢুকলাম। গেইট দিয়ে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম স্বচ্ছ পানির বিশাল লেক। লেকের তীরে দাঁড়ানো বোট। এ বোট দিয়েই যেতে হয় ঝর্ণার কাছে, কিন্তু আমরা হাঁটাপথে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে হেঁটে গেলাম ঝর্ণার কাছে। এ কী আজব সৃষ্টি ঈশ্বরের। প্রথমবারের মতো ঝর্ণা দর্শন। আমাদের সবার মধ্যে যেনো প্রাণ ফিরে এলো। কাপড় বদল করে সবাই নেমে পড়লাম ঝর্ণাতে। সে উচ্ছ্বাস! অনেকক্ষণ ঝর্ণাস্নান শেষে বোট যোগে লেক পাড়ি দিয়ে চলে এলাম আবার সিএনজির খেঁজে, এবার উদ্দেশ্য সমুদ্র দেখা। বাঁশবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, ইতিমধ্যেই পেটে চলছে ইঁদুর খেলা। ওখানে নেমে নতুন গড়ে উঠা বিদ্যুৎহীন একটা হোটেলে খাবার খেলাম জনপ্রতি একশো ত্রিশ টাকা করে, ডাল, আলুভর্তা আর মুরগি দিয়ে সবাই তৃপ্তি সহকারে খাবার শেষ করি। হোটেলের বিল পরিশোধ করে এবার চলে আসলাম সমুদ্র দর্শনে। বিশাল সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেলাম অনেক দূর থেকেই, মন উতলা করা সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ মন কেড়ে নিচ্ছে হাজারো সমুদ্র প্রেমীর হৃদয়। ঝাউ বাগান, জেগে উঠা ঘাসের চর, বালির মাঠ, খোলা সমুদ্রের হাওয়া সব মিলিয়ে কিছুটা চমৎকার সময় কাটালাম। ধূ-ধূ প্রকৃতির মাঝে এখানে সূর্যাস্ত অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর। এর মধ্যেই অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হল ব্রাহ্মণবাড়িয়ারর দুই আবৃত্তি শিল্পী মার্সি ও নুসরাত জেরিনের সাথে। এদের পেয়ে আমাদের টিমের আনন্দ আরও বেড়ে গেল। একের পর এক স্থিরচিত্র ধারণ আর গল্পে গল্পে বিকেল গড়িয়ে সমুদ্র পাড়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বুঝতে পারিনি। এবার ফিরতে হবে। এর মধ্যেই মার্সি আর নুসরাত বিদায় নিয়েছে, আমরাও রওনা দিলাম সীতাকুণ্ড রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে। রাত প্রায় আটটায় পৌঁছলাম স্টেশনে। গিয়ে শুনলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এমন কোন ট্রেন এখানে আজ থামবে না। আমরা দ্রুত যোগাযোগ করলাম স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে। তিনি বললেন আধঘন্টার মধ্যে একটা ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশনের দিকে যাবে। আমরা যেন এ ট্রেন ধরে চট্টগ্রামে চলে যাই। ঠিক আধঘন্টার মধ্যেই নাসিরাবাদ এসে থামল স্টেশনে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্লাটফর্মে পড়ে গেলেন সোপানা আপা, ফাহিম দলনেতার দায়িত্ব পালন করলো সফলভাবে, সবাইকে ট্রেনে উঠিয়ে সবার শেষে উঠল সে। একের পর এক যাত্রা বিরতি শেষ করে ট্রেন এসে থামলো চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে। আমরা হালকা নাস্তা শেষ করে অনেক চেষ্টা তদবির করে বসার মত সিটের ব্যবস্থা করে উঠে পড়লাম তূর্ণা নিশিতায়। মোটামুটি আরামেই রওনা হলাম আমাদের গন্তব্যের দিকে। সিট সংকটের কারণে তাজিম আর ফয়সাল সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে আসলো। মনে দাগকাটার মত একটি সুন্দর দিন কাটিয়ে আসলাম সীতাকুণ্ডে। মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা–

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্ধু।

আমরা আমাদের দেশটাকে আরো ভালো করে দেখতে হবে, হৃদয় দিয়ে আহরণ করতে হবে এর সৌন্দর্য।

লেখক: কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী

ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা-অসুবিধা ও সম্ভাবনার কিছু দিক

শান্ত কুমার দাস

মাইক্রোফাইন্যান্স বা ক্ষুদ্রঋণে দরিদ্রসহ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহিত করা হয়। সাধারণত এই ঋণ প্রদান করা হয় নিম্ন আয়ের মানুষের ও বেকারদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে। যারা ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণে অপারগ সেই দরিদ্র অসহায়দের সেবায় এগিয়ে আসে বিভিন্ন এমএফআই (MFI) বা মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশনগুলো।

এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে সমাজে বা রাষ্ট্রের মূলস্রোতে আনতেই ক্ষুদ্রঋণ সংগঠনগুলো কাজ করে থাকে। এই সংগঠন নন প্রফিট বা অলাভজনক। এমএফআইগুলো 'হিউম্যান অ্যান্ড সোশ্যাল' পলিসি অনুসরণ করে। ঋণগ্রহীতাকে যেকোনো উদ্যোগে শক্তিশালী টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাজেট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে সবরকম সহযোগিতা করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গ্রুপকে দায়বদ্ধ করে ঋণ প্রদান করা হয়। যেমন, প্রত্যেকটি সমিতিতে ৫ জনের একটি দল করে তাদের প্রত্যেকের সুপারিশে প্রত্যেককে ঋণ প্রদান করা হয়। এভাবে ঋণগ্রহীতার দায়বদ্ধতা বজায় থাকে, নিজের দল ও ঋণদাতা সংস্থার নিকট।

এমএফআইগুলো ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। আবার বেশিরভাগ স্বল্পোন্নত দেশে নারীরা অন্যের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ভূমিকা রাখছে নানাভাবে। এই ঋণের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টিতে ইনোভেশন ও স্কিল ডেভেলপমেন্টের মত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে। অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মূলধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

যে সকল ঋণগ্রহীতা সঠিক প্রকল্পে ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে দক্ষতার সাথে প্রকল্প পরিচালনা করে এবং হিসাবনিকাশ করে সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণগ্রহণ করে তারা লাভবান হয়।

তবে ঋণগ্রহীতারা বেশিরভাগ নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন হওয়ায় অনেক সময়ই তারা এই ঋণের অর্থ আয়মূলক কাজে ব্যবহার না করে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করে। ঐ অর্থ থেকে আসলে আয় হয় না, ফলে কারো কারো ঋণের কিস্তি পরিশোধে সমস্যা হয় এবং তারা ঋণের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আরো ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আবার, উদ্যোগী সমস্যাগ্রস্ত অধিকাংশ ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এসব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারের অন্যান্য পণ্যের থেকে পিছিয়ে থাকে। সেখানে যা ঘটে তা হলো, হয় ওই পণ্যের চাহিদা অনেক কম, অথবা তার মত বিকল্প পণ্য ইতোমধ্যেই বাজারে আছে। এই কারণে অনেক সময় উদ্যোগ গ্রহণ করেও টিকে থাকা সম্ভব হয় না।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রঋণ একমাত্র হাতিয়ার নয়। দারিদ্র্য দূর করতে হলে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে, মানুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করতে হবে এবং তার মৌলিক অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে।

ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করলে দেখা যায়, সমাজের পরিবর্তনে ও দেশের সার্বিক উন্নতিতে ক্ষুদ্রঋণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে ও সম্ভাবনা অনেক।

লেখক: সিদীপের কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাটোরে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি

সুমি খাতুন

পাঠাগার হলো জ্ঞান অর্জনের ভাণ্ডার। যেখানে সারি সারি সাজানো থাকে জ্ঞানের আলো। তা অর্জনের জন্য অবশ্যই পাঠাগারে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। পাঠাগার তো সব সময় বইয়ের সমারোহ নিয়ে অপেক্ষা করে কখন একজন পাঠক এসে বই পড়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে আলোকিত করবে। আমার এলাকার মধ্যে সব থেকে স্বনামধন্য পাঠাগার হলো ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি, নাটোর সদর উপজেলায়। প্রতিষ্ঠা করেন রাজা জগদিন্দ্রনাথ।

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আমন্ত্রণে ১৮৯৮ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটোরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে তিনি লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে। অক্ষয় কুমার মৈত্র ও রায় বাহাদুর জলধর সেন পালন করেন বই নির্বাচনের দায়িত্ব। স্যার যদুনাথ সরকার, প্রমথ বিশির মতে বরেণ্য ব্যাক্তিদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে লাইব্রেরির আঙ্গিনা।

ত্রিশের দশকে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী আবুল মসউদ ও লেখক গোবিন্দ সাহার মতো ব্যক্তিদের গতিশীল নেতৃত্বে লাইব্রেরিটি সমৃদ্ধ। নিয়মিত আয়োজন হতে থাকে পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ সাহিত্য সভা। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সভায় অতিথি হয়ে আসেন কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সাতচল্লিশে ভারত বিভক্তির পর ষাটের দশকে লাইব্রেরি পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় এই লাইব্রেরি। আশির দশকের এসডিও এ. এইচ. এস. সাদেকুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কথাসাহিত্যিক শফী উদ্দিন সরদারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রাণ ফিয়ে আসে লাইব্রেরির। আর ১৯৮৬ সালে জেলা প্রশাসক জালাল উদ্দিন আহম্মেদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের মধ্য দিয়ে লাইব্রেরির নতুন যাত্রা শুরু হয়। পাঁচ শতাংশ জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকা বর্তমানে লাইব্রেরি ভবনের তৃতীয় তলা জুড়ে মিলনায়তন নির্মানের কাজ তখন শেষের পথে।

পাঠক সমাগমে ভরপুর নব্বইয়ের দশক ছিল লাইব্রেরির সোনালি সময়। বিভিন্ন দিবস উদযাপন, সাহিত্য আসর আয়োজন, দেয়াল পত্রিকার প্রকাশনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এককভাবে আয়োজন করা হয় একুশের বইমেলার। এক্ষেত্রে দক্ষ সংগঠকের স্বাক্ষর রেখেছেন আলী আশরাফ নতুন ও মরহুম রশীদুজ্জামান সাদী। জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে একুশের বইমেলা আয়োজন ছাড়াও শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস উৎযাপন ছাড়াও অনিয়মিত আয়োজন হিসাবে থাকে সাহিত্য আসর।

প্রতি বছর ডিসেম্বরে আলোচনা-সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে বার্ষিক সাধারণ সভাটি। বার্ষিক সাধারণ সভাতে পাঠকদের লাইব্রেরিমুখী করতে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবনায় উঠে আসে বেশ কিছু বিষয়। এরই মধ্যে ই-বুক চালু ও শিক্ষার্থীদের জন্য বই পড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উল্লেখযোগ্য। নির্বাহী কমিটিতে একই মুখের আগমন না ঘটিয়ে নতুন মুখ সংযোজন ও কমিটির মেয়াদ তিন বছর থেকে কমিয়ে দুই বছর করার প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রস্তাবনায় বলা হয় প্রয়োজনে কম্পিউটার সংগ্রহ করা হবে যাতে ই-বুকও পরিকল্পনা করা যায়।

সদস্য, পাঠক ও সর্বসাধারণের জন্য ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি শনিবার ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৪:৩০টা হতে রাত ৯:৩০টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এ সময়ের মধ্যে প্রতি দিন সর্বনিম্ন ১৫০ জন করে পাঠক পাঠাগারে আসে। অনেক সময় এর থেকে বেশি পাঠকের সমাগম ঘটে এই লাইব্রেরিতে।

ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত সাহিত্য আসরের আয়োজন করে থাকে। এই আয়োজনের মূল বিষয়ই হলো পাঠকদের আরো বেশি বই পড়ার প্রতি আগ্রহ করে তোলা। লাইব্রেরির থেকে নিয়মিত ত্রৈমাসিক দেওয়াল পত্রিকা ‘বনলতা’ প্রকাশিত হয়।

কালের পরিক্রমায় বর্তমানে লাইব্রেরিতে এনাসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা, বাংলাপিডিয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মীয় গ্রন্থ, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বিশ্বকোষ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় বর্তমানে ১৪ হাজারের বেশি বই সংরক্ষিত আছে। অনেকে লাইব্রেরি কক্ষে বসে বই পড়েন আবার অনেকে বাড়িতে নিয়ে বই পড়তে পারেন। পাঠকগণ লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন ধরনের দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্র-পত্রিকাসমূহও পড়তে পারেন।

ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি নিয়মিত সাহিত্য আসরের আয়োজন করে যা মানুষকে বই পড়তে উৎসাহিত করে।

“ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরিটি” অনেক বড় এবং সমৃদ্ধ হওয়ায় এখানে ৩ জন ব্যক্তি কর্মরত আছেন। এর সভাপতি হিসেবে আছেন জনাব নাছের ভূঞা। সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন মো. আলতাফ হোসেন। সহ-সভাপতি হিসেবে আছেন এ্যাড. আব্দুল ওহাব।

কবি গনেশ পাল নিয়মিত পড়ার নেশা থেকে লাইব্রেরিতে আসেন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বইয়ের চাপে অস্থির। কোচিং-এর চাপে ওদের আর সময় নেই। তিনি আরো বলেন, এই লাইব্রেরিতে অসংখ্য বই রয়েছে। এখানে আসলে অনেক স্মৃতি ভেসে ওঠে। বই পড়া যে নেশা সেটা কেবল নিয়মিত পাঠাগারে আসলে উপলব্ধি করা যায়।

এ্যাড. বাকি বিল্লাহ রাশিদী লাইব্রেরির একজন শুভানুধ্যায়ী। তিনি একজন সাহিত্যিক ও কবি। তিনি মনে করেন, ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরিটি বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনেক উন্নয়ন করে আসছে। তিনি মনে করেন পাঠাগার হলো জ্ঞানের ভান্ডার।

শিক্ষা সংস্কৃতি সমৃদ্ধি সাধনে গ্রন্থাগারের অবদান অতুলনীয়। ঠিক তেমনিভাবে ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরিটির অবদান অনেক। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পাঠাগার তা পূর্ণ করতে পারে। সেজন্য নগর থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি জনপদে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার করা হলে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যাবে।

লেখক: সিদীপের শিক্ষাসুপারভাইজার, বনপাড়া শাখা, নাটোর

সামাজিক সংগঠন জীবনতরীর কথা

ফাহ্‌মিদা জেসমিন

সাধারণ ভাষায় সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কাজে সাহায্য করাকে সমাজ কর্ম বলে। এটি একটি সাহায্যকারী পেশা। সামাজিক কাজ সমাজ বিজ্ঞানের একটি অংশ বিশেষ, যেখানে সমাজকর্ম ও মানব সম্পর্কের উন্নয়ন বিষয়াবলী নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

সমাজকর্ম, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিকতা এবং দেশীয় জ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা আবদ্ধ, সামাজিক কাজ মানুষের এবং সমাজের কাঠামোকে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং সুস্থতা বাড়াতে নিযুক্ত করে। সামাজিক কাজ এমন একটি পেশা যা ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়কে তাদের ব্যাক্তিগত এবং সামষ্টিক মঙ্গল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আমার এলাকায় সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা

দেশের প্রায় প্রতিটি এলাকাই আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। আমার নিজ এলাকাও এর ব্যতিক্রম নয়। আমার এলাকার কিছু অসঙ্গতি এবং সেখানে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তার কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হল:

- দরিদ্রতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পারিবারিক বিশৃংখলা, অপরাধ প্রবণতা, কিশোর অপরাধ, মানব পাচার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার কার্যকর মোকাবেলায় সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- আমার এলাকায় যেসকল মনো-সামাজিক সমস্যা যেমন দাম্পত্যে কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, হতাশা, মানসিক দন্দ্ব, আত্মহত্যা ইতাদি প্রতিদিন ঘটেই চলেছে। এসকল সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
- আমাদের দেশে দরিদ্রতা একটি প্রধান সমস্যা। এই দরিদ্রতার কারনে সমাজে ভিক্ষা বৃত্তি একটি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রয়োজন। অপরদিকে সমাজকর্মীরা যখন কাওকে সাহায্য করবে তখন নিস্বার্থ ভাবে সাহায্য করবে। তাই সমাজে নিস্বার্থ সমাজকর্মীর প্রয়োজন রয়েছে।
- অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র ও নিরক্ষরতা, ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের এলাকায় নিরক্ষরতার হার তুলনামূলক ভাবে বেশি। এই নিরক্ষরতা মানব জীবনে উন্নতির পথে প্রধান বাধা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ফলপ্রসূ উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনেকটাই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

- এছাড়াও একজন সমাজকর্মী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণগুলি চিহ্নিত করেন এবং সেগুলি সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
- একজন সমাজকর্মী সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করে এবং তাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে।

তাই সমাজে অসঙ্গতি দূর করার জন্য আমাদের দেশে প্রত্যেকটা এলাকায় সমাজকর্মী বা সমাজকর্ম সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এলাকায় একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী বা সংগঠনের পরিচিতি:

আমার এলাকায় একটি সামাজিক সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে যার নাম "জীবনতরী সমাজকল্যান সংস্থা"। এই সংস্থাটি রাজশাহী জেলার, বোয়ালিয়া থানার ভদ্রার স্মৃতি-অম্লান চত্বরে অবস্থিত। এই সংস্থাটি ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার সভাপতির নাম মো. মারুফ হোসেন। তার সাথে কথা হলে তার এই সংগঠন নিয়ে তার একটি স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করি -

শুরুর গল্প

২০২০ সালে কয়েকজন সহযোদ্ধা ও সহকর্মীদের নিয়ে এনজিও করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং সেটি হবে অরাজনৈতিক ও অলাভজনক অর্থাৎ সেবামূলক। যেমন কথা তেমন কাজ। অবশেষে ২১ জন সদস্য নিয়ে ২০২১ সালে "জীবন তরী সমাজকল্যান সংস্থা" নাম দিয়ে শুরু করি। সেই থেকে সংগঠনটির পথ চলা। আস্তে আস্তে সকলের দোয়ায় সমাজে অবহেলিত এবং অসহায় দুস্থ মহিলা ও বেকার তরুণ তরুণীদের নিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। ২০২০ ও ২০২১ সালের করোনা মহামারীতেও এই সংগঠন অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া শীতে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছি। বিনামূল্যে হিন্দু-মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী বিতরণ করেছি। সকলের সহযোগিতাও পেয়েছি। পরে গত ১৫ সেপ্টেম্বর' ২০২২ তারিখে সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন পাই। এরপর আমাদের সংস্থার কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়।

সংস্থাটির নামকরণ কিভাবে হলো?

যেহেতু সমাজের কল্যাণার্থে কাজ করছি তাই এই সংস্থার নাম দিয়েছি "জীবনতরী সমাজকল্যাণ সংস্থা"। এছাড়াও যখন আমরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে সাথে জড়িয়ে পড়লাম তখন আনুষ্ঠানিক ভাবে ০১-০৮-২০২৩ তারিখে একটি "টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট" স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে এটি 'জীবনতরী টেকনিক্যাল ট্রেনিং একাডেমি' নামে পরিচিতি পায়।

সমাজকর্ম সম্পর্কে কিছু ধারণা

প্রসঙ্গত বলে রাখি আমি সমাজকর্মের ছাত্র নই। আমি একজন কোরআনের হাফেজ। তাই আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সমাজকর্ম সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছে তা হল: সমাজকর্ম একটি মহান পেশা। রিক্সাচালক তার সেবা ও শ্রম দিয়ে সমাজ সেবা করছে। ডাক্তার রোগ নিরাময় করে সমাজের সেবা করছে। ঝাড়ুদার তার কাজের মাধ্যমে রাস্তা ও পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখছে। মূলকথা সমাজসেবা করার জন্য জীবনের একটা ফোকাস বা লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে। সেই লক্ষ্যকে নিজের মস্তিষ্ক, ধমনী, রক্তনালী, পেশী সব জায়গাতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে তারপর দেখা যাবে যে একটা সময় সাফল্যের চূড়ায় ঠিক পৌছানো যাবে।

সমাজকর্ম কি একটি পেশা?

সমাজকর্ম একটি পেশা। তবে আমাদের দেশে সমাজকর্ম পেশাতে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। আমাদের দেশে এখনো শিক্ষার্থীরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট হতে চাইলেও কেউ সমাজকর্মী হতে চায় না। অন্য কোন পেশার পাশাপাশি মানুষ সমাজের জন্য কাজ করবে এমনটাই সবার ধারনা। সেক্ষেত্রে সমাজকর্ম যদি পেশা হিসেবে নেয়া যায় তাহলে এই পেশার প্রতি মানুষের ধারণা বদলে যাবে, মানুষের কাছে সমাজকর্ম/সমাজকর্মীর গুরুত্ব অনেক বাড়বে।

সমাজকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করার উদ্দেশ্য

আমি এই সমাজকর্ম করার পেছনে আমার জীবনে এক মর্মান্তিক কাহিনি আছে। আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে মারা যান। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে চিকিৎসার খরচ চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। এই কারণে তখন থেকে আমার লক্ষ্য ছিল যে আমি মোটামুটি সামর্থবান হলে গরীব ও দুঃখী মানুষদের জন্য কিছু করব। তাই আমি এখন এই কাজে জড়িত হয়েছি। আসলে এই সমাজকর্ম কাজগুলোকে আমি ভালেবেসে করছি।

"জীবনতরী সমাজকল্যাণ সংস্থা"-এর ভবিষ্যতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. মহিলা ও শিশু কল্যাণের জন্য কাজ করা। বিশেষ করে শিশু ও যুবতীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য অর্থনৈতিক বা সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা।

২. এটি হবে অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যাণমূলক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। যা তার কর্ম এলাকার বসবাসকারীদের মধ্যে বিশ্বাস, একতা ও মানসিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে এবং স্বনির্ভর ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করা

৩. বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৪. সমাজে শিশুশ্রম বন্ধ করে শিশু শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।

৫. নিরক্ষরতা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেওয়া।

৬. সামাজিক সমস্যা, চিকিৎসা, বিয়ে, শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দানে সহায়তা করা।

৭. বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থানের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের জন্য পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সচেতনতার উপর কাজ করা।

৯. ধূমপানমুক্ত সমাজ গড়তে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষদের প্রতিষ্ঠানের সামর্থ অনুযায়ী পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা।

১১. হতদরিদ্রের মাঝে গৃহপালিত পশু সরবরাহ করে খামার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করা।

১২. মুমূর্ষু অবস্থায় দুস্থ মানুষদের চিকিৎসা, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করা।

১৩. গরীব অসহায় দুস্থ মানুষদের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

১৪. গরীব অসহায় দুস্থ রোগীদের চিকিৎসাকল্পে হাসপাতাল স্থাপন করা হবে।

জীবনতরী সমাজকল্যাণ সংস্থার ভূমিকা ও বাস্তব চিত্র

৫ নভেম্বর ২০২১ সালে এই সমাজসেবামূলক সংস্থাটির শুভ সুচনা হয়। সংস্থার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন রাসিকের সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বর্তমান ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিযাম উল আজিম নিযাম।

এই দিনে ৯ জন অসহায় হতদরিদ্রকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এধরনের সেবামূলক কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির সভাপতি মো. মারুফ হোসেন।

মাস্ক বিতরণ: রাজশাহীতে ০৯-০২-২১ তারিখে করোনাকালীন সময়ে মাস্ক বিতরণ করা হয়। নগরীর রেলগেট শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান চত্বর থেকে শুরু হয়ে গণক পাড়া বাটার মোড়ে গিয়ে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি শেষ হয়। এসময় প্রায় ৩ শতাধিক সাধারণ জনগণকে জীবনতরী সমাজকল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়।

ঈদ উপহার বিতরণ: ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে সংস্থার পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। ২০২২ সালের ৩রা এপ্রিল নগরীর রেলগেটের রেশম কারখানার উত্তর পার্শ্বে ৩৫০ জনের বেশি পরিবারকে ঈদ উপহার হিসেবে সেমাই, চিনি, দুধ ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ: সংস্থার উদ্যোগে ০২-০২-২০২২ তারিখে সংস্থার কার্যালয়ে নগরীর বিভিন্ন এলাকার গরীব, অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

শারদীয় দূর্গোৎসব উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ: "শারদীয় দূর্গোৎসব উপলক্ষে ২০০ জন গরীব অসহায় মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

খাবার সামগ্রী বিতরণ: রাজশাহীতে সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার কার্যালয়ে গরীব অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে ১ কেজি ছোলা, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি খেজুর, ৫০০ গ্রাম মুড়ি ৫টি পণ্যের ১টি করে প্যাকেট ৩ শত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল।

এতিমদের সাহায্য: সংস্থার পক্ষ থেকে যারা এতিম তাদেরকে সহযোগিতা করে আসছে। কিছুদিন আগে একজন এতিম বাচ্চার মাদ্রাসায় লেখা পড়ার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে।

গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান: যে সকল শিক্ষার্থী ঝঝঈ তে এচঅ ৫ পেয়েছে তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থার সামর্থ্য অনুযায়ী উপবৃত্তি প্রদান করে।

বই উপহার: রাজশাহীর স্থানীয় কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে যারা ক্লাসে (১ম, ২য় এবং ৩য়) মেধাস্থান দখল করে তাদের বিনামূল্যে বই উপহার দেন এবং বই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

পাঠাগার পরিকল্পনা: সংস্থা ভবিষ্যতে পাঠাগার নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। এমন একটি পাঠাগার যেখানে যে কেউ ইচ্ছা অনুযায়ী বই নিয়ে গিয়ে পড়তে এবং ফেরত দিতে পারবে।

এছাড়াও বর্তমানে সেলাই, কম্পিউটার, এবং ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান সংগঠনটির সভাপতি জনাব মারুফ হোসেন।

ফ্রিল্যান্সিং বর্তমানে একটি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন তরী সমাজকল্যান সংস্থার সভাপতি জনাব মারুফ হোসেন বলেন, "সার্টিফিকেট এর জন্য এদেশের মানুষ যত পরিশ্রম করে তার কিছুটা যদি দক্ষতা অর্জনের জন্য করত তাহলে হয়তো কেউ বেকার থাকত না।

লেখক: সিদীপের শিক্ষাসুপারভাইজার, বাঘা শাখা, রাজশাহী

ইসমত আরা বেগম ও মোহাজ্জেমের কৃষিতে সফলতা

রিপন মিয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের একজন কৃষাণী ইসমত আরা বেগম,স্বামী- মোহাজ্জেম। তারা একসময় কঠিন সময় কাটাচ্ছিলেন। সংসারে খরচ চালানো যেখানে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ মেটানো ছিল আরও কষ্টকর। তবে একসময় আশার আলো দেখা দিল সিদীপ এনজিওর মাধ্যমে।

এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন সিদীপ এনজিওর ক্ষুদ্র ও এসএমএপি ঋণ কর্মসূচির কথা, যা কৃষকদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি প্রথম ধাপে তরমুজ চাষের জন্য ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন। ফলস্বরূপ তরমুজ চাষে সফলতা আসে। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তিনি লাভ করেন ৮০,০০০ টাকা।

প্রথম ধাপের সফলতায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিতীয় ধাপেও ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ নিয়ে ৩৭ শতক জমিতে শসা চাষ শুরু করেন। এ চাষ থেকেও তিনি ভাল আয় করেন। এ ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য পান এবং খরচ বাদ দিয়ে তিনি লাভ করেন ৭০,০০০ টাকা।

তৃতীয় ধাপে তিনি ৮০,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে ৩০ শতক জমিতে করলা চাষ করেন। এক্ষেত্রেও তিনি সফলতা পান এবং খরচ বাদ দিয়ে লাভ করেন ৬০,০০০ টাকা।

মোহাজ্জেম ও ইসমত আরার সংসারে এখন আগের মতো অভাব নেই। তাদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। বড় ছেলে অষ্টম শ্রেণিতে ও ছোট ছেলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। বড় মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে এবং ছোট মেয়ে এখনো ছোট। সন্তানের সবাই নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে।

বর্তমানে মোহাজ্জেমের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তিনি তার শ্রম ও সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শুধু ঋণ পরিশোধই করেননি বরং তিনি এখন নিজস্ব ১৫ শতক চাষের জমির মালিক হয়েছেন। সিদীপ এনজিওর সহায়তায় এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমের ফলে তারা এখন সফল কৃষক দম্পতি ও সচেতন অভিভাবক।

বহুমুখী সবজি চাষ করার মাধ্যমে তার পরিবারে এখন সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। ইসমত আরা বেগম জানায় যে, তার সবজি ক্ষেতের কোন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে উক্ত ব্লকের ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। এছাড়া তাকে ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরী ও ফেরোমন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারের ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বীজ, সার দিয়ে তাকে সহোযোগিতা করা হয়। বর্তমানে তাকে দেখে আশেপাশের এলাকার আরও অনেক কৃষক বহুমুখী সবজি চাষে আগ্রহী হচ্ছে।

লেখক: ফিল্ড অফিসার(এগ্রি) , ধরখার ব্রাঞ্চ , সিদীপ

একজন সফল কৃষকের গল্প

মো. মামুন আলী

শাহনাজ বেগম ও মো. আলী আজমের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। যদিও তাদের বর্গা চাষকৃত ২০০ শতাংশ জমি আছে, কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হতো না। তাই শাহনাজ বেগমের স্বামী প্রায় সারা বছরই অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করে এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে কাজ না থাকা এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রতিদিন কাজ করতে পারে না। ২ ছেলে ও ২ মেয়ে নিয়ে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। দরিদ্রতার কারণে দিনরাত স্বামী-স্ত্রী দুই জনে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয়না ।

পাড়া প্রতিবেশীর নিকট থেকে শাহনাজ বেগম সিদীপ সম্পর্কে ও সিদীপের বিভিন্ন ধরনের ঋণ সম্পর্কে জানতে পারেন। এর মধ্যে বিশেষ এক ধরনের ঋণ সম্পর্কে জেনে তিনি সে ঋণটি পেতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। বিশেষ এ কারণে যে এ ঋণটির কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর মেয়াদে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। বিষয়টি শাহনাজ বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন ঋণের টাকা দিয়ে তাদের জমিতে আখ, পাট, ধান ও সয়াবিন চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে লাভবান হওয়া সম্ভব। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে আলী আজমও স্ত্রীর কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর শাহনাজ বেগম সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর ভুট্টা ও পাট চাষ প্রকল্পে ৩০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তার জমিতে ভুট্টা চাষ ও পাট চাষ করেন। ৬ মাসে সব মিলিয়ে ভুট্টা ও পাট বিক্রয় করেন প্রায় ১,৫০,০০০ টাকার। এতে সব খরচ বাদ দিয়ে তার নীট লাভ হয় ১,১০,০০০ টাকা।

এই লাভের টাকা দিয়ে তারা ১টি গরু ক্রয় করেন। এরপর তার স্বামী মো. আলী আজম অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন। শাহনাজ বেগম এসএমএপি ঋণ গ্রহণের সময় প্রদত্ত টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনে গোসাইরহাট উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন। তাদের পরামর্শে তার ২০০ শতাংশ জমিতে ফসল বিন্যাস পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ ও পাট চাষ শুরু করেন এবং পরবর্তী ৬ মাসে গরু মোটাতাজাকরণ শুরু করেন।

বর্তমানে তারা ভুট্টা, মরিচ, আখ, সয়াবিন, সবজি, পাট ও গরু মোটাতাজাকরণ থেকে প্রতি ৬ মাসে প্রায় ১,২০,০০০ টাকার ভুট্টা, ধান ও সবজি বিক্রয় করেন। এছাড়াও তার ধান ও গরুর অবস্থাও ভাল। সব সময় ফসলের ও গরুর কোন সমস্যা বা রোগবালাই হচ্ছে কিনা তা সিদীপ গোসাইরহাট ব্রাঞ্চের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

শাহনাজ বেগম বলেন এই ফসল উৎপাদন, গরু পালন করতে তার জমি, জৈব সার, জমি চাষ, সেচ, নিড়ানি, কর্তন, ঘাস চাষ, দানাদার খাবার, ঔষধ, টীকা বাবদ প্রায় ৭০,০০০ টাকা খরচ হবে। বর্তমানে ফসল ও গরুর অবস্থা ভাল আছে তাতে ফসল ও গরু বিক্রয় করে প্রায় ৩,০০,০০০-৪,০০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে।

তারা আরও বলেন যে প্রতি বছর তারা পর্যায়ক্রমে আরও বেশি ভুট্টা, ধান, পাট, আখ, সয়াবিন চাষ ও গরু পালন করবেন। তার এ সকল কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য সকল মানুষ কৃষি ও গরু পালনের প্রতি উৎসাহ পেয়েছে এবং তার পরামর্শে এলাকার আরও অনেকে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও গরু পালন করছে এবং পরামর্শ দিতে পেরে তিনিও অনেক খুশি।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), মাদারীপুর ব্রাঞ্চ, সিদীপ

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন ও মানবতা ভাণ্ডার স্থাপন

১৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার হরিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পাবনা জেলার হাজী অজেল আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয় একই সাথে মানবতা ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার হরিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি জনাব মো. নজরুল ইসলাম ও পাবনা জেলার হাজী অজেল আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কাসেম। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীবৃন্দ, সিদীপের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও শিক্ষা সুপারভাইজারগণ। সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণায় ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান।

২২ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৫টি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় নূরজাহান মডেল স্কুলে, একইদিনে মুন্সীগঞ্জ জেলার আমিরুল হক পৌর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ২৫ মে ২০২৫ তারিখে পাবনা জেলায় জহুরা মহিউদ্দীন খান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে, ২৬ মে উক্ত জেলার মুক্তিযোদ্ধা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে এবং ২৭ মে সেই জেলায় এ.এইচ.সি. তরঙ্গ প্রিক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সিদীপের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও শিক্ষা সুপারভাইজারগণ। প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান।

২২ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নূরজাহান মডেল স্কুলে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়। ঢাকার স্কলাস্টিকা স্কুলের (গুলশান ক্যাম্পাস) শিক্ষার্থীদের দেয়া উপহার থেকে ১৫টি বই এ মুক্তপাঠাগারে দেয়া হয়। পরে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ইংরেজি গল্প পাঠ সেশন পরিচালনা করেন।

শিক্ষালোকের ৭ম লেখক-শিল্পী সম্মিলন

১৬ মে ২০২৫ তারিখে ঢাকায় সিদীপ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণ ও ৭ম শিক্ষালোক লেখক শিল্পী সম্মিলন। সম্মিলনে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি প্রফেসর ও বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। এছাড়াও ইউল্যাবের শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, বিশিষ্ট সাংবাদিক আমীন আল রশীদ, 'এবং বই' এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সিদীপ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য ফাহমিদা করিম, শিল্পী জাহিদ মুস্তাফা, শিল্পী শিশির মল্লিক, কবি শওকত হোসেন, শিল্পী বিপ্লব দত্ত, লেখক রিয়াজ মাহমুদ, সমাজকর্মী আবদুল হালিমসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মিলনে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সিদীপের ভাইস চেয়ারম্যান শাজাহান ভুঁইয়া ও লেখক-গবেষক সালেহা বেগম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। এই সম্মিলনে দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্যে ছিলো: মুক্তপাঠাগার নিয়ে গবেষণা উপস্থাপনা ও আলোচনা। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় মুক্তপাঠাগার নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র "আলোর যাত্রী হই।"

সম্মিলনের শুরুতে শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণ বিষয়ে কথা বলেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের ওপর আলোচনা করেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মাহবুব উল আলম। এরপর 'শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাসের ওপর মুক্তপাঠাগারের প্রভাব' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করেন সিদীপের কর্মকর্তা মাহবুবুর রশীদ অরিস।

প্রধান অতিথি শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণের জন্য শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের জন্য এখন পাঠাগার নিয়ে জাগরণের সময়। তিনি পঞ্চাশ-ষাটের দশকের মানুষের পাঠাগারমুখিতার সঙ্গে পরবর্তী সময়ের পাঠাগারবিমুখতার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং বর্তমানে আবার পাঠাগারের জাগরণের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন। কিশোর-কিশোরীদের বইমুখী করতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান।

পরে মুক্তআলোচনায় উপস্থিত সকলে অংশগ্রহণ করেন। লেখক, পাঠক, শিল্পী ও শিক্ষানুরাগীদের উন্মুক্ত এই আয়োজন বই ও পাঠাভ্যাসকে ঘিরে একটি প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

কাশিনাথপুরে পাঠক সম্মিলন ও বইমেলা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার এবং কাশিনাথপুরে অবস্থিত প্রয়াস পাঠাগারের উদ্যোগে এবং সিদীপের সহযোগিতায় ৭ই মে পাবনার কাশিনাথপুরে শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো বইমেলা, পাঠক সম্মিলন, পাঠাগার নিয়ে আলোচনাসভা এবং বইপাঠ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ।

সকালে কলেজের বারান্দায় মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। বইমেলায় বইয়ের পসরা নিয়ে উপস্থিত ছিল কলি প্রকাশনী, গ্রাম প্রকাশনী, নপম গণগ্রন্থাগার, দয়ালনগর বাহারুন্নেছা পাবলিক লাইব্রেরী ও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা', 'একাত্তরের হজমিওয়ালা', 'আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে' এবং 'পাবনার কবি ও কবিতা' এ চারটি বইয়ের ওপর সেরা পর্যালোচনালেখক ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে নপম, স্কাইলার্ক পথপাঠাগার, দীপশিখা, মাশুমদিয়া বিজ্ঞান স্কুল ও মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের সেরা পাঠকদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও ছিল উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে কলেজের মিলনায়তনে 'জাতি ও সভ্যতার বিকাশে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা' শীর্ষক মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। এ নিয়ে আলোচনা করেন সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের সভাপতি আবদুস ছাত্তার খান, লেখক শিশির মল্লিক ও শিল্পী বিপ্লব দত্ত।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তরিত কুমার কুন্ডু ও অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মাহবুব হোসেন।

আলোচকগণ বলেন, নিজেকে উন্নত করতে এবং সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গড়ে তুলতে আমাদের ছেলেমেয়েদের বেশি বেশি করে ভালো বই পড়তে হবে। আমাদের গ্রামেগঞ্জে, স্কুল-কলেজে, পাড়ামহল্লায় এবং জাতীয় পর্যায়ে অনেক পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজে দিনব্যাপী এ পাঠক সম্মিলন, বইমেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

‘সৃজনশীল কাজে যুক্ত শিশুরা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে’

১০ মে সিদীপ ভবনে আর্ট পোয়েট্রি ও শিক্ষালোকের যৌথ আয়োজনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাম্প্রতিক দেশকাল ও দেশকাল নিউজের সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সিদীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহজাহান ভুঁইয়া, চট্টগ্রাম চারুশিল্প পরিষদের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ এবং চট্টগ্রাম চারুশিল্প পরিষদের সহসভাপতি কাজী গোলাম কিবরিয়া। আর্ট পোয়েট্রির নির্বাহী পরিচালক শিল্পী শিশির মল্লিকের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ বলেন, “শিশুরা স্বর্গের ফুল, তারা পৃথিবীতে আসে স্বর্গের ফুল হিসেবে। তারা পৃথিবীতে আসে স্বর্গের সুবাস নিয়ে।” তিনি আরও বলেন, সৃজনশীল কাজে যুক্ত শিশুরা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

সিদীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন, “আমি আশাবাদী আগামীতে যারা সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থাকবে তাদেরকে সমাজ আরও ভালোভাবে মূল্যায়ন করবে।”

প্রতিযোগিতায় এ গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রুমাইয়া বশির নেত্র, প্রথম রানারআপ ফাতিহা সিকদার ও প্রশংসা বুদ্ধ দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে।

বি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফাহমিদা ফাইজা দিপ্তী, প্রথম রানারআপ আলিজা আমির, সিদরাতুল মুনতাহা দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে।

সি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রুকায়াত বিনতে মাহবুব, প্রথম রানার আপ শারমিন আকতার ও আলিফা খান আরশী দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে।

আর্ট পোয়েট্রির সভাপতি শামীম আকন্দের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উদ্যোগে
জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ও দ্বিজেন শর্মার জন্মবার্ষিকী

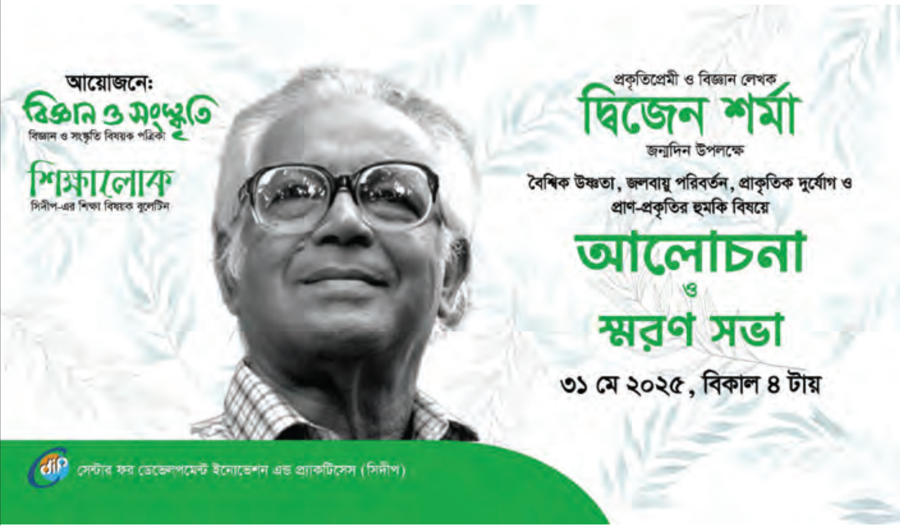

৩১ মে ২০২৫-এ বিকেলে 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' এবং 'শিক্ষালোক'-এর আয়োজনে প্রকৃতিপ্রেমী ও বিজ্ঞান লেখক দ্বিজেন শর্মার জন্মদিন উপলক্ষে বৈশ্বিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রাণ-প্রকৃতির হুমকি বিষয়ে আলোচনা ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় সিদীপের মিলনায়তনে। লেখক সালেহা বেগমের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার সাবেক অধ্যাপক ড. আমিন উদ্দিন মৃধা, সমাজচিন্তক শাহজাহান ভুঁইয়া, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ছোটকাগজের প্রধান সম্পাদক আশরাফ আহমেদ, ডেইলি স্টারের সাহিত্য সম্পাদক কবি ইমরান মাহফুজ, ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, শিল্পী শিশির মল্লিক, উন্নয়নকর্মী হাফিজুল ইসলামসহ অনেকে। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা।

শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম বলেন, "দ্বিজেন শর্মা ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক, তিনি জানতেন প্রাণ-প্রকৃতির জন্য হুমকি হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।"

কবি ইমরান মাহফুজ বলেন, "নিসর্গপ্রেমী দ্বিজেন শর্মা এক নিঃসঙ্গ মানুষ যার সঙ্গে কেউ ছিলো না, যিনি একা গাছ নিয়ে কাজ করেছেন।"

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন লেখক রিয়াজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানটিতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' পত্রিকার সম্পাদক লেখক আলমগীর খান এবং সঞ্চালন করেন নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী।

বইবিষয়ক পত্রিকা ‘এবং বই’-এর আয়োজনে বুক রিভিউ প্রতিযোগিতা

বইবিষয়ক পত্রিকা ‘এবং বই’-এর আয়োজনে বুক রিভিউ প্রতিযোগিতা ২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৬ এপ্রিল) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ও রাষ্ট্রচিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নায়লা ইয়াসমিন ও সাংবাদিক, গবেষক ড. কাজল রশীদ শাহীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ‘এবং বই’ এর সম্পাদক ও প্রকাশক ফয়সাল আহমেদ।

এই প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত ছিল বরেণ্য কথাসাহিত্যিক ও গবেষক আবদুর রউফ চৌধুরীর ‘রবীন্দ্রনাথ: চির-নূতনেরে দিল ডাক’, ও ‘নজরুল: সৃজনের অন্দরমহল’ নামের দুটো বই।

রিভিউয়ে অংশ নেয়া সেরা দশজন বিজয়ীর হাতে প্রায় ৬০ হাজার টাকার পুরস্কার তুলে দেন অথিতিবৃন্দ। এর মধ্যে ছিল প্রথম পুরস্কার দুটি ১০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার দুটি ৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কার দুটি ৩ হাজার টাকা করে। এ ছাড়াও নির্বাচিত সেরা ৪ জনকে ২ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। নগদ অর্থমূল্যের সঙ্গে প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে সমমূল্যের বই ও উত্তরীয় প্রদান করা হয়।

অয়োজনের বিজয়ীরা হলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ: চির-নূতনেরে দিল ডাক’ গ্রন্থে সুমন মজুমদার (প্রথম), পলাশ মজুমদার (দ্বিতীয়), কবীর আলমগীর (তৃতীয়), ইলিয়াস বাবর (বিশেষ) ও সিদ্দিকী হারুন (বিশেষ)। ‘নজরুল : সৃজনের অন্দরমহল’ গ্রন্থে নার্গিস সুলতানা (প্রথম), জাকিয়া সুলতানা (দ্বিতীয়), শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকী (তৃতীয়), রাকিবুল রকি (বিশেষ) ও জোবায়ের মিলন (বিশেষ)।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, ‘এবং বই’ বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ করছে এটা ভালো উদ্যোগ। যারা সমালোচনা লিখেন তাদের মনে রাখতে হবে এই ভাষায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র লিখেছেন, বেগম রোকেয়া, এস ওয়াজেদ আলী লিখেছেন। তাদেরই উত্তরাধিকারী আমরা। এই অবস্থা থেকে আমরা নিচে নেমে গেছি। আমাদেরকে উপরে উঠতে হবে। যারা সমালোচনা লিখবেন তারা তাদের নিজের মত অনুযায়ীই লিখবেন, কিন্তু অন্যদের মত বিবেচনায় রাখবেন।

লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ বলেন, রিভিউর জন্য নির্বাচিত লেখক আবদুর রউফ চৌধুরীর এই দুটো বই আমি পড়িনি, তবে তার অন্য রচনা পড়েছি। বাংলাদেশে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতার সম্পাদকেরা বুক রিভিউ খুব ছোট আশা করেন, চারশো শব্দের বেশি নয়। এটি আবার সাহিত্য পাতার সবচেয়ে নিচে ছোট আকারে ছাপা হয়। এখন যদি একটি সার্ভে হয় যে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের বই পড়েছি কি না– প্রতি একশো জনে একজন পাওয়া যাবে। যদি বলি টলস্টয় পড়েছি কি না– হয়তো এক হাজার জনে একজন পাওয়া যাবে। তরুণদের কথা বাদই দিলাম, আমি বয়স্কদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি এই সময়ে প্রধান আলোচ্য বিষয়

হচ্ছে, ইট-বালু-সিমেন্ট-কাঠ। এখানে বই, সিনেমা, গান, ছবির প্রদর্শনী কী হচ্ছে এসব নিয়ে কনসার্ন নেই।

কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নায়লা ইয়াসমিন বলেন, এখন আমরা ক্রমশ বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, ছোট ছোট লেখা পড়ছি, রিলস দেখে সময় কাটাচ্ছি। যেখানে চিন্তার জগৎটাই ছোট হয়ে আসছে। এমন একটা সময়ে এই আয়োজন করে 'এবং বই' অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 'এবং বইকে' ধন্যবাদ জানাই।

সাংবাদিক, গবেষক ড. কাজল রশীদ শাহীন বলেন, প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত দুটো বই-ই গবেষণামূলক। যার একটি কাজী নজরুল ও অপরটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আমরা সাধারণত দেখি একজন লেখক যে কোনো একটি বিষয়কে নিয়েই গবেষণা করেন, কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম লেখক আবদুর রউফ চৌধুরী। যিনি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দুটো বড়ো ধরনের গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রচলিত ধারার প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসে লেখক একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধারায় বই দুটি লিখেছেন। 'এবং বই' বুক রিভিউর জন্য এই বই দুটিকে নির্বাচন করে একটি মাইলফলক স্থাপন করেছে।

'এবং বই' সম্পাদক ও প্রকাশক ফয়সাল আহমেদ বলেন, প্রথমবারের মতো 'এবং বই' এই আয়োজন করেছে, ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি একটি কঠিন কাজ ছিল। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও উপস্থিত সুধীজন সকলকে ধন্যবাদ জানান তিনি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান লেখক আবদুর রউফ চৌধুরীর পুত্র ড. মুকিদ চৌধুরীকে এই আয়োজনে 'এবং বই' এর পাশে থাকার জন্য।

পুরস্কার জয়ী নার্গিস সুলতানা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমি এবং আমার মেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। মেয়ের উৎসাহেই মুলত আমার বুক রিভিউ লেখা। সুন্দর আয়োজনের জন্য 'এবং বইকে' ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কথাশিল্পী মনি হায়দার, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক সত্যজিৎ রায় মজুমদার, প্রকাশক হাসান তারেক, ঔপন্যাসিক মাসউদ আহমাদ, শামস সাইদ, ভ্রমণ লেখক গাজী মনসুর আজিজ ও কবি মাজহার সরকার, এবং বুক রিভিউ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া পুরস্কারপ্রাপ্তরা উপস্থিত ছিলেন।

সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজারদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা

৯-১০ ও ১৬-১৭ এপ্রিল ২০২৫ সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) - এর "শিক্ষা সুপারভাইজারদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে শিসক স্কুল পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় ও স্কুল পরিদর্শনের কৌশল নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা করা হয়। "মুক্তপাঠাগার" কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য একজন শিক্ষা সুপারভাইজারকে সমাজকর্মী সম্মাননা প্রদান করা হয়। মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে বই উপহার দেওয়ার জন্য 'এবং বই' এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ এবং প্রতিকথা প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী হানিফ রাশেদীনকে সিদীপের পক্ষ থেকে থ্যাংকস লেটার প্রদান করা হয়। এছাড়াও সমাজকর্ম বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

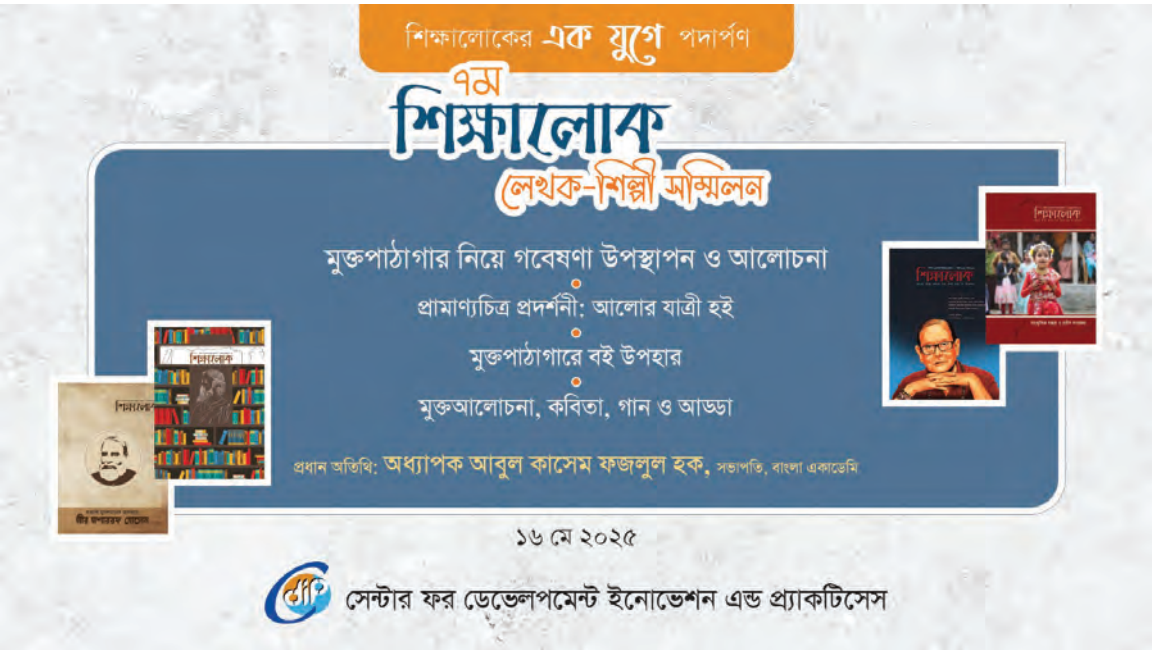

শিক্ষালোকের এক যুগে পদার্পণ
৭ম
শিক্ষালোক
লেখক-শিল্পী সম্মিলন
মুক্তপাঠাগার নিয়ে গবেষণা উপস্থাপন ও আলোচনা
প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী: আলোর যাত্রী হই
মুক্তপাঠাগারে বই উপহার
মুক্তআলোচনা, কবিতা, গান ও আড্ডা
প্রধান অতিথি: অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, সভাপতি, বাংলা একাডেমি
১৬ মে ২০২৫
সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা ও দ্বিজেন শর্মার জন্মবার্ষিকী

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
12th year 2nd issue, April-June 2025

গৃহিণীদের আস্থা
BLOOM গুঁড়া মশলা

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ
০১৩১৩০৩০৭৮১
ceo@cdipenterprise.com, sales@cdipenterprise.com